KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩ নং হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5" x 6"
Vol. & Number : ৪/7-8 ৪/9-10 ৪/11-12	Year of Publication : মাঘ - আষাঢ় ১৩২৮ চৈত্র - বৈশাখ ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় ১৩২৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র সেন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পত্র।

Zevgholatio,
Pelopsonnesos (Greece).
৭ই জুন, ১৯২২।

মান্যবরেষু,

যেখান থেকে আপনাকে চিঠি লিখ্‌ছি, সে জায়গাটায় বাধ্য হ'য়ে এক রাতের জন্য আট্‌কে গিয়েছি। বিকাল তিনটেয় এখানে এসে পৌঁছেচি, কাল সকাল সাড়ে আটটার ট্রেণ ধ'রে স্পার্টার দিকে (ত্রিপোলিস্ হ'য়ে) যাত্রা করবো। এটা চমৎকার পাহাড়ের অঞ্চলের মধ্যে একটা ছোট্ট গ্রীক গাঁ, এক গেঁও হোটেলে আশ্রয় নিয়েছি। হাতে কিছু কাজ নেই, সারা সকালটা টাট্টুর পিঠে চ'ড়ে চচ্চড়ে রোদ্দুরে টহল দিয়ে, তারপর তিন ঘণ্টা ধ'রে এই ভীষণ গরমে তৃতীয় শ্রেণীর রেলে ভ্রমণ করে, শরীর আর মন দুইই ক্লান্ত। ঘরে জামা টামা খুলে ঠাণ্ডা হয়ে, জানালার ধারে ফুরফুরে হাওয়ায় ব'সে, ভাগ্যিস্ রবিবাবুর চয়নিকা একখানা সঙ্গে এনেছিলুম, সেখানার পাতা উল্টে উল্টে দেশের কথা ভাবছি, এমন সময় মনে হ'ল, আপনাকে একখানা চিঠি লিখি—কারণ এই ভ্রমণের আনন্দের সমজদার আপনার মত পাবো না। গ্রীসে এসেছি দিন নয় দশ হ'ল। আপনাকে বোধহয় শেষ চিঠি লিখি লণ্ডন থেকে। তার পরের মধ্য-পর্ব্বটা একটু

আপনাকে ব'লে নিই। ১৯২১-এর আগস্ট থেকে ১৯২২-এর এপ্রিলের শেষ পর্য্যন্ত, এই মাস নয়েক একটানা পারিসে কাটাই। এখানে জনকতক বড় বড় আচার্য্যের—যেমন অধ্যাপক আন্তোআন মেইয়ের—শিষ্যত্ব স্বীকার ক'রে সর্‌বন্ আর কলেজ্-দ্য-ফ্রাঁস-এর ছাত্র হ'য়ে থাকি—কোনও ডিগ্রির জন্য চেষ্টা করি নি। মাঝে কিছুকাল ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আর আনুষঙ্গিক বাতে বড্ড ভুগি। তারপর পারিসের পাট চুকিয়ে, ইউরোপের অন্য দেশ একটু ঘোরবার জন্য বার হই। মে মাসের মাঝামাঝি ইটালীর পাদুআ বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তশতকীয় উৎসব হয়, সেই উপলক্ষ্যে ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে প্রথম পাদুআয় আসি। পাদুআয় তিন দিন থাকি। ভারতীয় প্রতিনিধি আমরা ছিলুম তিনজন—তিনজনই কলকাতার—আর দুজন হচ্ছেন, ডাক্তার দেবেন্দ্র নাথ মল্লিক আর ডাক্তার ফণীন্দ্র নাথ ঘোষ। প্রায় ৪০।৪৫টী ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিনিধি জড় হয়েছিলেন—কোথায় চিলি আর কোথায় ফিন্‌লাণ্ড আর চীন। ভারতের মান এক ক'ল্‌কাতাই রক্ষা করেছে কতকটা। অথচ পাদুআ থেকে ভারতের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ পত্র এসেছিল, ইটালীয়ানে আর সংস্কৃতে। সপ্তশতকীয় উৎসবের প্রধান দিনে প্রতিনিধিদের মধ্যে জনকতক আর সকলের হ'য়ে পাদুআর প্রতি অভিনন্দন বাণী পাঠ করেন। এঁদের প্রোগ্রামে ছিল যে, প্রতিনিধিরা যাঁরা বলচেন তাঁরা যে যার নিজের দেশের ভাষায় বলবেন। আমরা তাই সংস্কৃতে একটা ছোট সাময়িক নিবেদন লিখে রাখি। সেটীকে আমি দেবনাগরী অক্ষরে হাণ্ডমেড পেপারে পুরাণো পুঁথির আকারে তৈরী করে রাখি। যোগাযোগে হয়ে গেল যে ভারতবর্ষের—এসিয়ার

তরফ থেকে সেটা বৃহৎ সভায় আমাকেই আগে পড়তে হ'ল। ফলে প্রোগ্রামের এই অংশটুকু দেবভাষায় স্বস্তিবাচন ক'রে আরম্ভ হ'ল। আমার মনে হয়—এই গর্ব্বটুকু ক্ষমা করবেন—দেবভাষার অপমান আমি করি নি, বিরাট জনসঙ্ঘের মধ্যে সংস্কৃতের উদার ধ্বনি একটু শ্রদ্ধা ও হর্ষের সঞ্চার করেছিল। পারিসে ক'মাস থাকার দরুণ ফরাসী ভাষাটায় কাজ-চালানোগোছ একটু দখল হয়েছে—সাধারণ কথাবার্ত্তা এক রকম চালাতে পারি, তাই অবলম্বন ক'রে পাদুআর অন্য দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে, ইটালিয়ান অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলাপ সালাপ কিছু কিছু করতে পারা গিয়েছে। প্রায় সব শিক্ষিত লোকই,—ছাত্রদের মধ্যে একটু বেশী চিন্তাশীল আর খোঁজ-খবর-রাখিয়ে আর পড়িয়ে যারা,—তারা রবিবাবুর বই পড়েছে, আর তাঁর অনুরাগী। তিনজন শ্যামবর্ণ ভারতীয় প্রতিনিধি এই বিশ্ব-পণ্ডিত-সভায় উপস্থিত থাকায় ফল ভালই হয়েছে। অনেকের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষা-চিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করতে পারা গিয়েছে। Li delegati Indiani dell' Universitá di Calcutta, chi parlano Sanscrito হিসেবে দলে দলে ছাত্র ছাত্রী এসে রোমান আর দেবনাগরী অক্ষরে আমাদের তিনজনের হস্তাক্ষর নিয়েছে। পাদুআর ইটালীয়ান শিক্ষিত সমাজের যে হৃদ্যতার আর সৌজন্যের পরিচয় পেয়েছি, বাস্তবিকই সেটা একটা মাথা পেতে নেবার জিনিস। পাদুআ প্রথম এইরকম এক বিরাট ব্যাপারে ভারতকে আহ্বান ক'রে, তাকে বিদ্যানুশীলন আর তত্ত্বজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে অন্য জাতের সঙ্গে সমান আসন দিয়েছে—এটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। ইচ্ছে আছে, পাদুআর ব্যাপার আর আমাদের তা

কেমন লাগল, এ সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত ক'রে কোনও বাঙলা পত্রিকার জন্য লিখবো। কিন্তু স্থির হ'য়ে না ব'সলে তা হচ্ছে না। এখন যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করে আছি—সারাদিন ঘুরে শ্রান্ত হ'য়ে বাসায় ফিরে কিছু লেখবার মত মানসিক ও শারীরিক অবস্থা থাকে না। সব বিষয়ের নোট্ রাখছি কিছু কিছু, এই যা।

পাদুআ থেকে ভেনিসে আসি, ভেনিসে কাটাই পাঁচ দিন। সান্‌মার্কো আর কানাল্ গ্রান্দে দেখে মনটা বিশেষ পুলকিত হয়েছে—বিশেষ সানমার্কোর বিজান্তীন-বাস্তুপ্রণালীর মন্দির, আর তার ভিতরের মোসাইক্ কাজ, চিত্তকে অভিভূত করে ফেলেছে। আবার একবার অন্ততঃ ভেনিসে যেতেই হবে। ভেনিসের পর দুদিন বলঞাতে, দুদিন রাভেন্নাতে। এ দুটী জায়গায় ইটালীপন্থী বাঙালী সাধারণত বোধহয় যায় না। রাভেন্নার দুটো টান—দান্তের সমাধি, আর আমি বিশেষ করে যে জন্য গিয়েছিলুম—এর বিজান্তীন যুগের মন্দির আর তার ভিতরকার মোসাইক্ দেখতে। দেখে খুসী হয়েছি খুব। রাভেন্না থেকে দিনের ট্রেণে ব্রিন্দিসি পর্য্যন্ত লম্বা পাড়ী। ও পথটা আপনার নিশ্চয় দেখা আছে। একদিকে আদ্রিয়াতিক সাগর, আর একদিকে সবুজে-ভরা ইটালীর পাহাড়, ক্ষেত, গাঁ—প্রকৃতি নীল আকাশের তলায় হাসছে—ইটালী বাস্তবিকই সুন্দর দেশ। আঙুরলতার মাচার (pergola) নীচে ইটালীয়ান মেয়ের দল হাসি আর গানের মধ্যে গৃহকার্য্যে রত রয়েছে, বড় সুন্দর লাগল। ব্রিন্দিসি থেকে এক গ্রীক জাহাজে করে সরাসরি আথেন্স্-এ। পথে ঘণ্টা তিনেকের জন্য করফুতে নামতে পাই, সেখানে সহর ছেড়ে একটু ভিতরে গাড়ী করে ঘুরে আসি—করফু ইটালীর মতই সুন্দর।

গ্রীস দেশটা মোটেই সুন্দর নয়—কেবল পাহাড়, পাহাড়, গাছপালার অভাব, আর সহর ছেড়ে এখানকার মফঃস্বলের একটু পরিচয় পেয়ে, এখানকার ভ্রমণপ্রণালীর উপর, আর গাড়োয়ান, ঘোড়াওয়ালা, দালাল, হোটেলওয়ালা জাতীয় জীবের উপর তাদৃশ প্রীতির ভাব হচ্ছে না। আথেন্স-এ কিন্তু আক্রোপলিস্-এর উপর পার্থেননের ভাঙা মন্দির দেখে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পার্থেনন যতটা সুন্দর, ছবি দেখে দেখে, বর্ণনা প'ড়ে, মনে মনে কল্পনা করে আসছিলুম, প্রকৃতই পার্থেনন ততটা, কি তার বেশী, সুন্দর। এ পর্য্যন্ত মানুষের সৃষ্টি বড় বড় কতকগুলি মন্দির দেখলুম—যেমন ভুবনেশ্বরের মন্দির, তাজ, ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের কতকগুলি গথিক কাথিড্রাল, সান্‌মার্কো—সব গুলিই সুন্দর, কেউ কারুর চেয়ে বড় তা বলা চলে না; কিন্তু পার্থেনন ও ঐ জাতীয় গ্রীক মন্দিরের সরল অনলঙ্কৃত রূপে যে একটা গাম্ভীর্য্য, দার্ঢ্য ও তার সঙ্গে সঙ্গে সৌকুমার্য্যের সমাবেশ পাওয়া যায়, তা আমার মনে হয় অন্য মন্দিরগুলিতে মেলে না। আর এইজন্য আমি গ্রীক-বাস্তুশিল্পের একটু বিশেষ পক্ষপাতী। আথেন্স-এ ছিলুম দিন চার, রোজই পার্থেনন দেখে এসেছি—ফিরবো আথেন্স-এ দিন পাঁচেক পরে, দুদিনের জন্য, চাঁদিনী রাতে পার্থেনন দেখতে পাবো তখন। আথেন্স্ থেকে বার হয়ে সরাসরি আসি দেল্‌ফিতে। আপোল্লোনের ক্ষেত্র এখন ভাঙা পাথরের ধস্‌নায় পরিণত হ'য়ে আছে। তবে পারণাসস্ পাহাড়, আর আশপাশের গম্ভীর mystic ধরণের প্রাকৃতিক দৃশ্য,—মন্দিরের স্থানটা পাহাড়ের গায়ে এক বিরাট amphitheatre-এর এক অংশে যেন—আর কাস্তালিয়া ঝরণা, খুবই উপভোগ করা গেল। দেল্‌ফি আসা একটু মুস্কিল—আথেন্স্

থেকে ঘণ্টা নয়েক জাহাজে ক'রে, তারপর পাহাড়ে উঠতে হয়, তিন ঘণ্টা গাড়ী, না হয় ঘণ্টা দুই আড়াই টাট্টুতে ক'রে। আথেন্স-এর কতকগুলি ভদ্র, শিক্ষিত গ্রীক পুরুষ ও মহিলার সঙ্গে একত্র আসি। দেল্‌ফির কাস্তালিয়া ঝরণার তলায়, এঁদের আয়োজিত গ্রীক গ্রাম্য-ভোজ আর উৎসব দেখতে পাওয়া যায়—নিকটবর্ত্তী গাঁ থেকে কতক-গুলি পল্লীবাসীদের এঁরা ডাকিয়ে এনে, গ্রীক-গান, গ্রীক-নাচ, গ্রীক-বাজনা, এই সব ঘণ্টাকতক ধ'রে করান। গ্রীক-গান যা শুনলুম, তার সুর আমাদের দেশের মতই লাগল, আর কতকগুলি folk-songs একেবারে বাউলের বা রামপ্রসাদীর মত বোধ হ'ল। আবার কতকগুলি তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ার মত। নাচে waltz-জাতীয় নাচের ভাব নেই, মেয়ে পুরুষে হাত ধ'রে গোল হ'য়ে ধীরে ধীরে পাঁয়তারা ক'রে ঘোরে, অতি ধীরে, মাঝে মাঝে হাতের সুন্দর ভঙ্গী দেখা যায়। এই দুটী জিনিস গ্রীক-চাষাদের পূর্ব্বপুরুষদের থেকে লব্ধ বলে বোধহয়, গান আর নাচ। বাজনা মনে হ'ল তুর্কীদের কাছ থেকে নেওয়া—সানাই, আর এক রকম ঢাক্, ব্যস্। গ্রীক-ভোজের উপকরণ হচ্ছে, ছাগলের মাংসের কাবাব,—আস্ত ছাগলের ধড়টাকে আগুণে ঝলসায়,—রুটী, ছাগল দুধের দই। এঁরা খুব সৌজন্য দেখালেন আমাকে—জিনিসটা নোতুন ব'লে বেশ আমোদ পাওয়া গেল। তারপরে এঁদের গান টানের পর আমায় ধরলেন, ভারতীয় গান কি আবৃত্তি কিছু এঁদের শোনাতে। প্রায় সকলেই "তাগোরে"র (Tagore এর গ্রীক উচ্চারণ) কিছু কিছু পড়েছেন,—গ্রীকে। রবিবাবুর কিছু শুনতে সনির্ব্বন্ধভাবে চাওয়ায়, কাস্তালিয়া ঝরণার তলায়, প্লেন গাছের ঘন ছাওয়ায়, উর্ব্বশী থেকে গোটা

তিনেক পর্ব্ব আবৃত্তি করলুম। ভাষার মাধুর্য্যের খুব তারিফ হ'ল—বাঙালী কেউ থাকলে আবৃত্তি করতে সাহস করতুম না—আবৃত্তির পর যা পড়লুম তার ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ এল। মোটের উপর, শনিবার দুপুরটা বেশ কাটল।

দেল্‌ফি থেকে টাট্টুতে চ'ড়ে উৎরাই ক'রে আবার ইতেয়া বন্দরে সন্ধ্যেবেলা জাহাজ ধরে, পাত্রাস হয়ে, পরশ্ব দিন ওলিম্পিয়াতে এসে পৌঁছই। দ্যৌঃ পিতা Zeus Pater-এর ক্ষেত্র, ওলিম্পিক খেলার স্থান। মন্দিরের মধ্যে একটীও আর খাড়া নেই। এক মিউজিয়ম ক'রে সেখানে এইখানে পাওয়া ভাস্কর্য্যের নিদর্শন কিছু কিছু রেখেছে, তার মধ্যে প্রাক্সিতেলেসের হের্ম্মেস আর ওলিম্পিয়ার জেউসের মন্দিরের কিছু কিছু মূর্ত্তি সুপ্রাচীন, পঞ্চম শতাব্দীর গ্রীক ভাস্কর্য্যের চমৎকার নমুনা। আর জায়গাটা অতি সুন্দর, চারদিকে ছোট ছোট পাহাড়, আর খুব ঘন গাছপালা, ঝাউ গাছ, সাইপ্রেসই বেশী।

এ অঞ্চলে ট্রেণ আসে একদিন অন্তর। ওলিম্পিয়ায় দু'রাত কাটাতে হয়। মতলব, স্পার্টায় যাবো—খানিক পথ রেলে, খানিক মোটরে। স্পার্টায় প্রাচীন গ্রীক—লিকুর্গস, লেওনিদাস-এর সময়ের সহরের চিহ্ন নেই—খালি কিছু প্রাচীন মূর্ত্তি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে, তা স্থানীয় মিউজিয়মে জমা হয়ে আছে। স্পার্টার আশপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য নাকি অতি সুন্দর—তাইগেতস্ পাহাড়ের। কিন্তু স্পার্টার দিকে টেনেছে আমাকে, স্পার্টার কাছে মিস্ত্রার বিজান্তীন যুগের এক সহরের ধ্বংসাবশেষ—এত সুন্দর বিজান্তীন মন্দির বাড়ী ফ্রেস্কো নাকি আর কোথাও নেই। এই সহরের ভোগকাল ১৪।১৫ শতক। পরশ্ব মিস্ত্রা দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করবো।

স্পার্টার পর আথেন্স, রেলে ক'রে, পথে আর্গস, তিরিন্স, মিসেনী (বা মুকেনাই) সারবার বাসনা আছে। তারপর দিন দুই আথেন্স-এ থেকে আবার ব্রিন্দিসি। ইটালীতে পাএস্তম্ (নেপল্‌স্-এর দক্ষিণে), নেপল্‌স্, রোম, আসিসি, পেরুজিয়া, ফ্লরেন্স, পিসা, জেনোয়া, মিলান—এতগুলো জায়গা দেখতে হবে। তারপর অষ্ট্রিয়া হ'য়ে জারমানী—জারমানীতে দু'মাস—জুলাই, আগষ্ট—তারপর লণ্ডন—লণ্ডনে সেপ্টেম্বারে হপ্তা তিনেক—তারপর অক্টোবারে জাহাজ ধ'রে বাড়ী।

নেহাৎ একলা ঠেকলেও, এরকম বেড়াতে আমার মন্দ লাগে না। সকালে ওলিম্পিয়াতে সাতটার ট্রেণ ধরে, পির্‌গস্ বলে এক জংশনে আটটায় নেমে, সেখানে বারোটায় অন্য গাড়ী ধরে, জেভযোলাতিওতে তিনটেয় আসবার কথা। স্পার্টার দিকে যাবার গাড়ী সেই কাল সকালে। এখানে একটী বিকেল আর রাত্তিরটী কাটানো, ভ্রমণের প্লানের মধ্যেই আছে। এখন ওলিম্পিয়া থেকে গাড়ী ছাড়ে সকাল সাতটায়—latest যে টাইমটেবল্ কিনেছি, তাতে তাই বলে। সব ঠিক ঠাক ক'রে, ছ'টায় উঠে সাতটার গাড়ী ধরে পির্‌গস্ আসবো এঁচে আছি,—না আজ ভোর পৌনে পাঁচটায় হোটেলওয়ালা দরজায় ধাক্কা দিয়ে হল্লা সুরু কল্লে, ভাঙা ফরাসীতে আর খুব তড়বড়ে গ্রীকে,—গাড়ী সাতটায় নয়, পাঁচটায়। এ গাড়ী না পেলে ওলিম্পিয়ায় আবার দু'রাত কাটাতে হবে—তাড়াতাড়ি পনেরো মিনিটের মধ্যে কাপড় চোপড় প'রে ব্যাগটী নিয়ে দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ষ্টেশনে পৌঁছতে পৌঁছতেই দেখি, গাড়ী ছেড়ে দিলে! হোটেলওয়ালা তখন তার ফরাসী ভুলে গিয়ে ক্রমাগত গ্রীকে excited ভাবে আলাপ সুরু

করলে। কিছুক্ষণ pantomime-এর পর একজন ইংরেজীওয়ালা গ্রীক পাওয়া গেল (গ্রীস থেকে হাজার হাজার লোক বছর বছর আমেরিকায় যায়, সেখানে ২।৩।৫।৭।১০ বছর কাটিয়ে, কিছু কামিয়ে আবার দেশে ফিরে আসে, তাই প্রায় প্রতি গ্রামে ২।৪ জন ইংরেজি বা আমেরিকান-ওয়ালা লোক মেলেই—সহরে ফরাসী আর ইংরেজিতে চলে, আর গাঁয়ে দেখছি ইংরিজি হলে আটকায় না—গ্রীক না জানলেও চলে যায়)—ঠিক হল, পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঘোড়ায় ক'রে ঘণ্টা তিনেকের ভিতর এক ছোট ষ্টেশনে পৌঁছনো যাবে, যেখানে পিরগস্-জেভযোলাতিওর বারোটার গাড়ী ধরা যাবে। কিন্তু ৩০ দ্রাখ্‌মা বেশী লাগবে এতে। তথাস্তু। গম্ভীর হ'য়ে ঘোড়ার পিঠে একদিকে ব্যাগ, আর একদিকে যুগল জঙ্ঘা রেখে বসা গেল। একদল সঙ্গী জুটল—এক আমেরিকা-ফেরত গ্রীক, স্ত্রী আর চারটী কাচ্ছা বাচ্ছা নিয়ে ওলিম্পিয়া থেকে আমাদেরই পথে পড়ে এক গাঁয়ে যাচ্ছে; এরা চলেছে পায়ে হেঁটে, মালপত্র বোঁচকা বুঁচকি চড়িয়েছে এক খচ্চরের পিঠে। এক সহিসই আমাদের দুটো জানোয়ারের তদারকের ভার নিয়েছে। আর লোক পাওয়া গেল না। এদের নিয়ে মুস্কিলে পড়া গেল একটু। এরা তো তাড়াতাড়ি চলতে পারে না—আবার এক বিপদ হ'ল, এক নদী পেরুতে হ'ল, ঘোড়ার পেট অবধি জল—একে একে এদেরও পার করাতে হ'ল ঘোড়ায় ক'রে। অবশেষে এরা ঘরে পৌঁছতে, সহিস এক ঘোড়ায়, আর আমি আরটীর, দস্তুর মত সওয়ার হ'য়ে, ঘণ্টা দুই চড়াই উৎরাই ক'রে, যথাস্থানে উপস্থিত হলুম। এরকম experience জন্মে হয় নি—মন্দ লাগছিল না। যদিও আবার ট্রেণটী miss করার সম্ভাবনা বিভীষিকা দেখাচ্ছিল। জিনিসটার

নোতুনত্ব ছিল, তবে মাথার উপর সূর্য্যদেব দেশেরই মত প্রখরভাবে করুণা বিতরণ করছিলেন, সেটী পুরাতন বটেই, কিন্তু পুরোণো বন্ধুর মত আনন্দদায়ক ছিল না।

এখন স্পার্টায় কি ঘটে জানা নেই, তবে এইবার সভ্য-জগতে প্রবেশ করছি, ট্রেণ এদিককার ষ্টেশনগুলোতে দিনে বার দুই ক'রে পাওয়া যায়।

আশা করি' আপনি ভালো আছেন, আর বন্ধুবর্গের কুশল। সত্যেন্দ্রের খবর কি? আর ধূর্জ্জটীর? * * * দিলীপের সঙ্গে প্যারিস ত্যাগ করার পূর্ব্বে প্যারিসেই দেখা হয়েছে—Sévres-তে আমাদের অধ্যাপক ঝুল-ব্লকের বাড়ীতে গান টানের মজলিস বেশ জমানো গিয়েছিল। আমি ভাল আছি। ব্যার্লিনে বিস্তর ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা হবে। ইতি—

শ্রীসুনীতি।

সাহিত্যে সমদর্শন।

আজ যখন য়্যুরোপের রাষ্ট্রনীতির শাসন ভারতবর্ষকে কুমারিকা হতে হিমালয় পর্য্যন্ত মথিত করচে, তখনো আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়, কবি এবং রসজ্ঞগণ একাগ্র চিত্তে আলোচনা কর্‌চেন য়্যুরোপের সাহিত্য।

এর কারণ কি?

স্বার্থের দিক থেকে যাঁরা জীবনের অসংখ্য চেষ্টার সার্থকতা দেখতে চান, তাঁরা বলবেন য়্যুরোপের স্বাধীন জাতিগণের সাহিত্যের আলোচনায়, আমাদের মনে, স্বাধীনতা লাভ করবার স্পৃহা জাগ্রত হবে; কালে আমরাও তাঁদের সঙ্গে সমান পা ফেলে চল্‌তে পারব।

বেশ ভাল কথা।

কিন্তু এরও চেয়ে একটা বড় স্বার্থ যে মানুষের আছে—একমাত্র মানুষেরই। সেটা হচ্ছে আমাদের মন যতই কেন দেশ, কাল, এবং কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার অধীন হউক, স্বরূপে উহা বিশ্বজনীন। এবং এই বিশ্বজনীন মনে যে ভাব, রস, এবং আনন্দ রয়েছে, কবিগণ তা অখণ্ড ভাবেই উপভোগ করেন, এবং আমরা পাঠকগণ তার মন, ভাব, রস ও আনন্দকে সাহিত্যে অখণ্ড ভাবেই উপভোগ করতে চাই। একমাত্র মানুষই এ উপভোগ করতে পারে—তার দেহ যতই নশ্বর হউক। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মাটির উপর পা ফেলে চলে যাওয়ায় যে সুখ নেই, তা নয়; কিন্তু ঐরূপ মনোভাব ত জলচর, স্থলচর, খেচর জীবেরও আছে। কিন্তু তাদের সাহিত্য নেই। এইটি ভগবান মানুষকে বিশেষ ভাবেই দান করেচেন; বিশ্বের সাহিত্যের পানে চাইতে চাইতে রসজ্ঞ পাঠক উপলব্ধি করেন "আমার এত রূপ।"

(২)

নানা দেশের নানা কালের কবিগণের বাহিরের আকৃতিতে যে পার্থক্য দেখা যায়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। য়্যুরোপের কবিগণের সভা হতে, বাংলার কবিকে আমরা এক নজরেই চিন্‌তে পারি। এটা শুধু আধারের বিশিষ্টতা, সত্য-বস্তুতে, ভাব, রস এবং আনন্দে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। আধারের বর্ণ ও আকার আধেয় পায় বটে এবং এই আধারটি গঠিত হয় কবির দেশের জলে, মৃত্তিকায়, পারিবারিক এবং সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায়। বাংলায় সেক্স্‌পিয়ারের কিম্বা ইংলাণ্ডে বিদ্যাপতির আবির্ভাব কখনই সম্ভব নয়,—কেননা উক্ত দুই দেশের জলবায়ু, সমাজ, ধর্ম্ম এক নয়।

ভাব, রস এবং আনন্দের আধারে আধারে পার্থক্য আছে বলে আমরা যেন আধেয়কে বিচ্ছিন্ন করে না দেখি। অশিক্ষিত মনের স্পষ্ট লক্ষণ বংশাভিমান, জাত্যভিমান কিম্বা আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করে বিশ্বসাহিত্যে সেই একই সত্যবস্তু উপভোগ করবার সময় এসেছে। আমাদের উপভোগের জন্যই ত "রসো বৈ সঃ" এর এই আত্মদান; এই দান গ্রহণ যে না করবে, সেই দরিদ্র থাকবে, এই লীলা যে উপভোগ না করবে, সেই নিরানন্দ থাকবে।

কিন্তু মানুষ এত নির্ব্বোধ নয়। এই জন্যই দেখা যায় যে, স্বাধীন এবং পরাধীন জাতিগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা নিয়ে যখন যুদ্ধ বেধে যায়, তখনও রসজ্ঞ মানুষ তাঁদের প্রতিযোগীর সাহিত্যও আলোচনা করে থাকেন। কেননা ভূমির বন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করে, ভূমার মধ্যে বিশ্বজনীন মনকে এবং মনের ভাব, রস, আনন্দকে উপভোগ না করে তার নিষ্কৃতি কোথায়?

(৩)

অস্ত্রধারী সম্রাট যখন দেশের ধর্ম্ম, সভ্যতা রক্ষা করতেন, তখন যাই হউক না, এখন দেখা যাচ্চে যে, সকলেই ইচ্ছা করেন, রসজ্ঞ মানুষের মধ্যে সদ্‌ভাব স্থাপিত হয়। বিষয়ীগণ তাঁদের দেশের কবিকে জাতীয় সম্পত্তিরূপে দাবী করলেও, এই সত্য তাঁরাও উপলব্ধি কচ্চেন যে, কবিগণ কখনো কোনো দেশের জাতীয় সম্পত্তি ছিলেন না, কখনো হবেনও না; তাঁরা বিশ্ববাসীর চিরসুহৃৎ, তাঁরা স্ব স্ব মনের বিশ্বজনীন ভাব উপলব্ধি করে, বিশ্ববাসীর মনের মধ্যে সত্য স্থান স্ব-বলে এবং সবলে অধিকার করেছেন; নিখিল মানব মনের উপর তাঁদের স্বত্ব স্থাপিত হয়েছে; এখন, এমন কোনো অস্ত্রধারী সম্রাট কিম্বা শাস্ত্রব্যবসায়ী ধর্ম্মসংঘ নেই—যাঁরা কবিগণকে তাঁদের এই স্ব-স্থান হতে ভ্রষ্ট করতে পারেন; গণপ্রাণ এখন ভাবে, রসে, আনন্দে জীবিত থাকবার ব্যাকুলতায় নিখিল মানব-মনের সহবাস কামনা করচে, কবিগণ—যাঁরা "বিশ্বের বাসিন্দা"—তাঁরাই এই মিলন এই যুগে ঘটিয়ে তুলছেন।

(৪)

কবির সত্য বাসস্থান কোথায়? আলোচ্ছায়ায় রহস্যময়ী, অনন্ত ভাবময়ী প্রকৃতির মধ্যে। প্রকৃতির কি অনন্ত যৌবন-লীলা, কত বর্ণের বৈচিত্র্য, কত রাগিণীর রমণীয়তা, কত রসের রহস্য কত নিবিড় রোমাঞ্চ। আর কবির মনের মধ্যে অরূপকে রূপের মধ্যে দেখবার কি চেষ্টা, অনির্ব্বচনীয়কে নানা ছন্দে ঘোষণা করবার

কি আনন্দ! সাহিত্যের এবং তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উন্নতি সঙ্গীতের উৎপত্তি ত ঐ চেষ্টা ঐ তৃষ্ণা, ঐ আনন্দ হতেই। ভূমির বন্ধন হতে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা, কবির পক্ষে স্বাভাবিক বলে আমরা যেন এই ভ্রম না করি যে, ভাব, রস, আনন্দ হতে কবি মুক্তি কামনা করেন। এ বন্ধন থাকার দরুণ কবি কখনই এই ভয় করেন না যে, তাঁর মন ঊর্দ্ধগামী না হয়ে, রসাতলের তিমিরগর্ভে বিলুপ্ত হবে। প্রকৃতির মধ্যে বাস করাতে কবির মন স্তরে স্তরে জেগে ওঠে, তাঁরও ভাবময়ী প্রকৃতি ধীরে ধীরে পূর্ণ যৌবন লাভ করে সুন্দরী, লীলাময়ী, আনন্দময়ী হয়ে ওঠে, এবং সেই প্রকৃতি পরমপুরুষকে নানা ভাবে কামনা করে, কলা নিকেতন গড়ে ওঠে সৃষ্টির ক্রোড়ে, আর একটী নূতন সৃষ্টি; মানুষের অতুল কীর্ত্তি, ভগবানের যশোমন্দির।

(৫)

কিন্তু মানুষ মানুষ; মানুষের মনে, নেই যে কোন্ ভাব, কোন্ রস, তা ত দেখা যায় না; কামিনী এবং কাঞ্চনে স্পৃহা যেমন বলবতী, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করবার আকাঙ্ক্ষাও যেমন তীব্র, যশস্বী হবার আগ্রহ যেমন উন্মাদিনী, তেমনি সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, পবিত্রতার জন্য, লোকহিতের জন্য আত্মদান করবার ব্যাকুলতাও তেমনি মানুষের মনের মধ্যে আছে; প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব লাভ করবার স্পৃহাও এই মানুষের মনে, আবার মহাত্মাদের চরণে প্রণত হয়ে, ক্ষুদ্র অহঙ্কার বিলীন করে দেবার ব্যাকুলতাও এই মানুষের মনে। জগতের সঙ্গে সংগ্রামে যে তীব্র সুরাপানের উন্মত্ততা আছে, এ রস তাঁরা পেয়েছেন, যাঁরা যুদ্ধে নেমেছেন; আবার আশ্রিতকে রক্ষা করবার জন্যও

একমাত্র মানুষেরই অন্তরে দয়া আছে। সাহিত্যে সেই জন্য, এই মনেরই নানা বৃত্তির উৎপত্তি, বৃদ্ধি এবং বিলয় দেখা যায়। এই মন হতেই দুর্য্যোধনের সৃষ্টি, ধর্ম্মপুত্রের সৃষ্টি, শয়তানের সৃষ্টি, দেবব্রতের সৃষ্টি; এমন কি দেবগণেরও সৃষ্টি। এই মন হতেই সীতা সাবিত্রীর, ওফেলিয়া ইভের সৃষ্টি, এমন কি দেবীগণেরও সৃষ্টি। মন যখন প্রকৃতির আলোতে জেগে ওঠে, তখন তার সকল প্রবৃত্তিরই উৎপত্তি, বৃদ্ধি, বিলয় হয়ে থাকে; এই জন্যই কি কেউ মনকে প্রকৃতির আলোতে জাগিয়ে তুলতে ভয় করে?

কিন্তু জগতে বাস করে, তা কি করে সম্ভব? আর জাগিয়ে না দেখলেই কি সাত্ত্বিক ভাব লাভ হবে? জড়তা কিম্বা ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা কিম্বা কৃত্রিমতা মানুষকে কখনই সাত্ত্বিক করে না; কবিগণ মনকে অসংখ্য আকাঙ্ক্ষার, ভাবের, রসের মধ্যে বিশ্বজনীন ভাব উপলব্ধি করেই মনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁদের কাব্যে নাটকে, উপন্যাসে, গানে দেখা যায়, এই মনের আশা কি সুদূর-ব্যাপিনী, এর আকাঙ্ক্ষাই না কি উন্মাদিনী। সেইজন্য আদি হতে শান্ত রস, দাস্য হতে মধুর ভাব পর্য্যন্ত সকলই সাহিত্যের সত্যবস্তু; সকল বিকার, সংস্কার এবং কৃত্রিমতা হতে মন মুক্ত হওয়াতে, নিখিল ভাব রস পান করবার অধিকার লাভ তাঁরা করেন।

এই মনকে আমরা যেন শ্রদ্ধা করি। কামনা হতে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে, মানব-জীবনের যা থাকে, তা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য, এক অব্যক্ত অবস্থা। তার কোন চিত্রই হতে পারে না। বৈচিত্র্য সেইখানে, যেখানে মন প্রাণের অব্যক্ত রহস্যপুর থেকে জেগে স্বপ্রকাশ আনন্দ-পুরে যাবার জন্য নানা দিকে পথ করে চলেছে। বৈচিত্র্য মনের

চলনে, তার আকাঙ্ক্ষায়, তার আত্ম-বিকাশের বেদনায়। তখন মনের একি আশ্চর্য্য উন্মেষ! কবিগণের ক্রিয়াশীল মনই বিশ্ব-মানবকে একই আকাশের নীল চন্দ্রাতপের নিম্নে, কলা-নিকেতনে নিয়ে এসেছে, এই মিলন সাধন এই যুগে কবিগণই ঘটিয়ে তুলছেন।

প্রকৃতি চিরদিনই নবীনা, চিরদিনই লীলাময়ী। এখনো বাতায়নের সম্মুখে বসে প্রান্তরের অপর প্রান্তে তিমির-কন্যা উষার কিরণাভা কোমল নীল আকাশে ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হতে গাঢ়বর্ণে ছড়িয়ে পড়তে দেখলে, সেই আনন্দই লাভ করা যায়, দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কবি যা উপভোগ করেছিলেন; এবং এখনও নানা দেশের কবিগণ যা উপভোগ কচ্চেন। সেই একই মন, সেই একই প্রকৃতি, সেই একই বাহিরের সহিত অন্তরের যোগ, সেই একই আনন্দ।

(৬)

সেইজন্য বিশ্বের সকল জাতির সাহিত্যকে এখন অখণ্ড ভাবে দেখবার সময় এসেছে। এ দেখার মানে উপভোগ করা। এই যে বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টির ক্রোড়ে আর একটি সৃষ্টি—এর মধ্যে আসলে আছে কি? বহির্জগতে রূপের মধ্যে, রসের মধ্যে, বর্ণের মধ্যে, যেমন ভগবানের বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হয়েও দেখা যায়, তাঁর দ্বারা বিধৃত হয়ে আছে, বিশ্ব-সাহিত্যেও ঐরূপ দেখা যায় যে, মানুষ কোনো প্রবৃত্তিরই শক্তিতে এতদূরে ছিটকে পড়তে পারে না—যেখানে ভাব, রস, আনন্দ হতে সে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হতে পারে। কি সাধুর চিত্তের আত্ম-বিষাদে, কি পাপীর অনুতাপানলে, সেখানেও দেখতে পাই ভগবান বিরাজমান।

কত যুগ যুগ ধরে সাহিত্যে মানুষ তার প্রকৃতির মুক্তি কামনা করে আসুচে। সংসারের লাভ ক্ষতির দিকে না চেয়ে, মান অপমানের দিকে দৃক্‌পাত না করে, নির্ভয় চিত্তে বিশ্বাত্মারই যশোগান করে কবিগণ চলেছেন, সেই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার তীব্র গতিতে আত্মসমর্পণ করেছেন, সাহিত্য যতটুকু গড়ে যেতে পেরেছেন, তা অপেক্ষা কত অসংখ্য সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন; সেই বিরাটের, অসীমের স্বপ্নে বিমুগ্ধ সাধক কবিগণ কেবলমাত্র একটি আশায় প্রফুল্ল হয়েই সান্ধ্য-সূর্য্যের পানে স্তিমিত নেত্রে চাইতে চাইতে অনন্ত নিশীথের গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেছেন; কেবল রেখে গেছেন, একই মনের বিচিত্র প্রকাশ; নানা ভাবের বৈচিত্র্য, নানা রসের আত্ম-বিহ্বলতা! যা রেখে গেছেন, তা কি সামান্য! যে আশার, আকাঙ্ক্ষার মহাসমুদ্র কবির প্রাণের অতল তলে নিত্য মথিত হয়, এবং ঋষির দুরদর্শিতায় ভবিষ্যতে সাহিত্যের সৃষ্টি হবে, এমন সম্ভাবনা দেখেছেন—সেই আকাঙ্ক্ষাই বা কি অসীম।

আর তাঁরা রেখে গেছেন একটা দৃঢ় বিশ্বাস যে ভাবময়ী প্রকৃতির লহরী লীলা মানুষকে তাঁরই কাছে নিয়ে যায়, যিনি অনন্ত ভাবময়, যাঁর ভাব, রস, আনন্দে তৃণ হতে তারকা পরিপূর্ণ; তাই বিশ্ব-সাহিত্য আশায়, বিশ্বাসে, আনন্দে উজ্জ্বল।

মানব মনকে এখন প্রশ্ন করবার সময় এসেছে, বিধাতার এই দান গ্রহণ করতে, এই আনন্দ উপভোগ করতে সে কি প্রস্তুত?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।

২০শে আষাঢ়, ১৩২৯।

আমাদের মত-বিরোধ।*

(১)

নন্-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের মতভেদ থাকা উচিত কি না, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তা যে আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ; অতএব তা অস্বীকার করেও কোন ফল নেই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা-কংগ্রেস যে দিন নন-কো-অপারেশন গ্রাহ্য করে, সেই দিনই এ সত্য অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, কংগ্রেসী বাঙালীদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই কংগ্রেসের এই নূতন প্রোগ্রামের বিপক্ষে ছিলেন।

তারপর, অর্থাৎ নাগপুর কংগ্রেসের পর, এ দলের ভিতর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ জন কয়েক অসহযোগ-ব্রত অবলম্বন করেন। বাদবাকী সকলে ও ব্যাপার থেকে আলগা হয়ে থাকেন।

যাঁরা নন্-কো-অপারেশনে যোগ দেন নি, তাঁরা যে সকলে ও আন্দোলন থেকে একই কারণে স'রে দাঁড়িয়েছিলেন, তা অবশ্য নয়। অতএব এটা অনায়াসে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে যে, যে ব্রত অবলম্বন করতে হ'লে, চিন্তার ও জীবনের চিরাভ্যস্ত পথ ত্যাগ করতে হয়, সে ব্রত গ্রহণ করবার পক্ষে কারও বাধা ছিল মনের, কারও বা চরিত্রের, আর অধিকাংশ লোকের একসঙ্গে ও দুয়ের।

এ সত্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবার দরকার নেই। সাধারণতঃ মানুষের মতামতের পিছনে তার বিচারবুদ্ধি ততটা থাকে না—যতটা

* মাসিক বসুমতী হইতে উদ্ধৃত।

থাকে তার চরিত্র, তার রাগ-দ্বেষ, আর তার চিরকেলে অভ্যাস। হৃদয়ের ও উদরের কথাকে মস্তিষ্কের বেনামীতে চালিয়ে দেওয়ার অভ্যাসও যে মানুষের আছে, তা সেই জানে, যে মানুষের কথার পিছনে তার মন দেখতে চায়। যাঁরা নন্-কো-অপারেশন আন্দোলনের দর্শকমাত্র ছিলেন, তাঁরা সকলে যে একমন নন, তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কেন না, যাঁরা ও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁরাও সকলে একমন নন। আমি নিজ কানে নন্-কো-অপারেশনের অন্ততঃ পঞ্চাশ রকম ব্যাখ্যা শুনেছি, যা সব পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। ও ব্যাপারের ঔদরিক ও আধ্যাত্মিক ভাষ্যকারের সঙ্গে কার পরিচয় নেই? আর যাঁরা নন্-কো-অপারেশনের একটি নিয়মও একদিনের জন্যও পালন করেন নি, অথচ উক্ত মতের গোঁড়া ভক্ত তাদের সংখ্যা অসংখ্য। এ শ্রেণীর লোকের মতামত যে অকিঞ্চিৎকর, তা বলাই বাহুল্য। নন্-কো-অপারেশন যে একটা কর্ম্মের পদ্ধতি, শুদ্ধ জ্ঞানের কিংবা ভক্তির বিষয় নয়, ও মতানুসারে কাজ না করে ও মত গ্রহণ করায় যে কোনই সার্থকতা নেই, এই সহজ কথাটা মনে রাখলে বাঙলার বহুলোক সকাল সন্ধ্যে ওকালতী করে, রাত্তিরে দুর্দ্দান্ত অসহযোগী হয়ে উঠতেন না। গত ১২ই ফেব্রুয়ারি বার্দ্দোলীতে যে রিজলিউসান পাস হয়, তার ফলে এঁদের মুখ বন্ধ হয়েছে।

(২)

উক্ত মত সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর যখন মতভেদ আছে, তখন তাঁদের কথায় ও লেখায় সে মতভেদের প্রকাশ অনিবার্য্য। কেন না, লেখাপড়া হচ্ছে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই কাজ।

তারপর নিজের মন্তব্য প্রকাশ করতে গেলে লোকে সেই সঙ্গে তার স্বপক্ষে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতেও বাধ্য, আর বিপক্ষ মতখণ্ডন করবার চেষ্টা করতেও বাধ্য। এরূপ তর্কস্থলে, লোক চিরকাল ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এসেছে, আর চিরকাল তা করবে। তর্ক-যুদ্ধও যুদ্ধ এবং সে যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য লোকে নানা প্রকার আলঙ্কারিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। আর যে তা করতে পারে না, সে চীৎকার করে। এ হচ্ছে মানুষের স্বভাব; মানুষের মন একমাত্র syllogism-এর পথ ধ'রে চলে না। মানুষের মস্তিষ্ক তার রক্ত-মাংসের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নয়। এ যোগ থাকাটা মোটেই দুঃখের বিষয় নয়। দুঃখের বিষয় হয় তখন, যখন রক্তমাংসে মস্তিষ্ক একদম চাপা পড়ে।

মানুষে মানুষে মতভেদ ঘটলেও তাদের ভিতর সকল সময়ে মনোমালিন্য ঘটবার প্রয়োজন নেই। দেখতে পাওয়া যায় যে, মনোমালিন্য বেশীর ভাগ সেই ক্ষেত্রেই ঘটে, যেখানে পরস্পর পরস্পরের কথা ভুল বোঝে। আমাদের পলিটিকসের কাম্যবস্তু যে কি, সে বিষয়ে বোধ হয় আমরা সকলেই একমত। আর যে ক'জন নন, তাঁদের কোন কথাই বলবার নেই। তাঁরা হয় অতিমানুষ, নয় অমানুষ। এ ক্ষেত্রে পরস্পরের ভিতর যা প্রভেদ, সে হচ্ছে উক্ত উদ্দেশ্যলাভের উপায় নিয়ে। সুতরাং প্রথম থেকেই ধ'রে নেওয়া উচিত নয় যে, আমরা পরস্পর পরস্পরের জ্ঞাতিশত্রু। দ্বিতীয় কথা, আমাদের কারও মত এতাদৃশ চূড়ান্ত নয় যে, তার আর কোন বদল হ'তে পারে না। আমরা তর্ক সুরু করি অবশ্য অপরের মত বদলে দেবার জন্য, কিন্তু তার ফলে শেষটা অনেক সময়ে নিজের মতই বদলে যায়। বুলি বদলায় না শুধু তোতাপাখীর।

(৩)

এই নন্-কো-অপারেশন বিষয়ে তর্ক অনেক সময়ে যে অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডায় পরিণত হয়, তার কারণ পরস্পরের মতভেদ যে কোথায় তার্কিকেরা সকল সময়ে সে দিকে নজর দেন না। সে যাই হোক্, কোন্ বিষয়ে যে আমরা সকলে একমত, সেটা যদি আমরা স্পষ্ট জানি, তা হ'লে আমাদের তর্কে এড়ো হয়ে পড়বার সম্ভাবনা ক'মে আসে।

নন্-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের ভিতর মতের অমিল থাক্‌লেও মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজকের দিনে আমরা সবাই একমত। এ কথা যে অন্ততঃ আমার মুখে সুধু কথার কথা নয়, তাই প্রমাণ করবার জন্য আমার মতে তাঁর মাহাত্ম্য যে কোথায়, তা পরিষ্কার ক'রে বলবার চেষ্টা করব।

মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল অসাধারণ। এই চরিত্র কথাটা নানা লোকে নানা অর্থে বোঝে। সুতরাং তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব কোথায়, সেইটিই হচ্ছে দ্রষ্টব্য।

ইংরাজীতে যাকে বলে asceticism, তার প্রতি আমার একটা সহজ শ্রদ্ধা আছে। কাষায় বসনকে আমি দেখবামাত্র উচ্চ আসন দিই। কিন্তু তাই ব'লে যিনি শারীরিক ক্লেশ সম্বন্ধে উদাসীন আর যিনি শারীরিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে বর্জ্জন করেছেন, তাঁকেই আমি মহাপুরুষ বল্‌তে প্রস্তুত নই। কেন যে নই, তার উত্তর গীতার এই শ্লোকে পাবেন।—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

মাহাত্ম্য আত্মার ধর্ম্ম, দেহের নয়; সুতরাং আমার কাছে মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যের সঙ্গে উপবাসাদির বিশেষ কোনও সম্বন্ধ নেই। মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে আমি এই কটি অসাধারণ গুণ দেখিতে পাই। তিনি সম্পূর্ণ নির্ভীক; সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, কথায় এবং কাজে তিনি সম্পূর্ণ অকপট এবং সম্পূর্ণ সংযত; তাঁহার নির্ভীকতা আর পরার্থ-পরতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। সুতরাং এ বিষয়ে বেশী কিছু বল্‌বার প্রয়োজন নেই। মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতার ভাষা যে কতদূর স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন, সকলে তা লক্ষ্য করেছেন কি না জানিনে। এ ভাষায় কোন আড়ম্বর নেই, কোনও অলঙ্কার নেই, কোনও বাহুল্য নেই, কোনও অত্যুক্তি নেই; তাঁর এ ভাষা যেমন সংযত, তেমনি শক্তিশালী। এর কারণ, ভাষায় তিনি তাঁর মনের নগ্ন রূপ লোকের চোখের সুমুখে ধ'রে দেন। তাঁর ভাষার শক্তি ও রূপের পিছনে আছে তাঁর চরিত্র। সম্পূর্ণ অকপট হ'তে পার্‌লে মানুষের ভাষা যে কি অসাধারণ প্রসাদগুণ লাভ করে, তার পরিচয় মহাত্মা গান্ধীর ভাষা, যদিচ সে ভাষা তাঁর মাতৃ-ভাষা নয়, একটি বিদেশী ভাষা। আমি তাঁর ভাষার উল্লেখ কর্‌লুম তাঁর চরিত্রের একটা গুণ দেখাবার জন্য, তাঁর বক্তৃতার সাহিত্যিক গুণের পরিচয় দেবার জন্য নয়। আমরা যাকে ষ্টাইল বলি, সেটা যে মনের গুণ, ভাষার গুণ নয়, মহাত্মা গান্ধীর ভাষা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নন্-কো-অপারেশন ব্যাপারের প্রধান বল হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রবল। ঐ প্রোগ্রাম যদি অপর কেউ, যথা ভি, জে, পাটেল সৃষ্টি কর্‌তেন, তা হ'লে তার জন্ম মৃত্যু যে একই তারিখে হ'ত, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনই সন্দেহ নেই।

বিপিন বাবু একবার বিদ্রূপ ক'রে বলেছিলেন যে, তিনি "লজিক" বোঝেন, "ম্যাজিক" বোঝেন না। লৌকিক মনের উপর মহাত্মা গান্ধীর যে অলৌকিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাকে ঐন্দ্রজালিক বললে অত্যুক্তি হয় না, এবং একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, এ ম্যাজিক হচ্চে তাঁর চরিত্রবলের মন্ত্রশক্তি।

(৪)

মহাত্মা গান্ধীর নির্ভীকতা ও পরার্থপরতা সম্বন্ধে আমার মনে কখনো তিলমাত্র সন্দেহ স্থান পায় নি। তবে তাঁর মুখের কথা যে পূরোপূরি তাঁর মনের কথা, এ বিশ্বাস আমার বরাবর ছিল না। আমার মনে এ সন্দেহ পূর্ব্বে হয়েছে যে, হয়ত তিনি তাঁর মনের কথা সম্পূর্ণ খুলে বলেন নি। রাজনীতির সঙ্গে কূটনীতির যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, ও নীতিতে উদ্দেশ্য যে তার উপায়কে পূত করে, আবহমান কালের ইতিহাস তার প্রমাণ দেয়। অতএব পলিটিশিয়ান-দের কথা যে সম্পূর্ণ সরল, সে বিষয়ে সন্দেহ মানুষের মনে সহজেই জন্মে। তার পর অসংখ্য নন্ কো-অপারেশন-ভক্তদের মুখে অগণ্যবার শুনেছি যে, একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, মহাত্মা গান্ধীর কথা সাদা ভাবে বোঝা, না বোঝারই সামিল, এবং এই সব ভাষ্যকাররা তাঁর কথার নানা গূঢ় ও কূট অর্থ আমাকে শুনিয়েছেন।

আদালতে তাঁর বিচারের সময়, তাঁর কথা ও তাঁর ব্যবহার আমার মন থেকে চিরদিনের জন্য এ সন্দেহ দূর করেছে। তাঁর কথা যে সম্পূর্ণ অকপট, ঐ বিচারক্ষেত্রেই তা প্রমাণ হয়ে গেছে। যেমন কোন কবির প্রতিভা, তাঁর রচিত নানা কাব্যের ভিতর কোনও

একখানি বিশেষ কাব্যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে, তেমনি উক্ত বিচারস্থলেই মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রের সৌন্দর্য্য ও শক্তি সম্পূর্ণ ব্যক্ত হয়েছে। নির্ভীকতায়, সরলতায়, সংযমে ও সৌজন্যে ও ক্ষেত্রে তাঁর আত্মোক্তি—আমার কাছে একটি work of art স্বরূপে গণ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটি মহাপুরুষের, সক্রেটিসের, বিচারের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, আর সে বিবরণ আজ তিন হাজার বৎসর ধ'রে মানুষের মনকে মুগ্ধ ও তুষ্ট ক'রে আস্‌ছে। মহাত্মা গান্ধীর বিচারের বিবরণ প'ড়ে আমার ঐ সক্রেটিসের বিচারের কথাই মনে পড়ে। যে সকল গুণের সদ্ভাবে, সক্রেটিসের আত্মোক্তি সাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে, প্রায় সে সকল গুণেরই সাক্ষাৎ মহাত্মা গান্ধীর আত্মোক্তিতে পাওয়া যায়। সক্রেটিসের apology বাঙ্গালায় অনুবাদ কর্‌বার আমার ইচ্ছা আছে। যদি কখনো সে অনুবাদ কর্‌তে সমর্থ হই, তা হ'লে বাঙালী পাঠকমাত্রেই দেখতে পাবেন যে, ও উভয়ের ভিতর একটা মস্ত আভ্যন্তরিক ঐক্য আছে।

বর্ত্তমানে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে মানুষের মহত্ত্ব, কে কি করে, তাই দিয়ে আমরা যাচাই করি; কে কি, সে বিষয়ে ততটা মন দিই নে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতায় মনুষ্যত্বের মাপকাঠি ছিল স্বতন্ত্র। আজকাল আমাদের আত্মচেষ্টার লক্ষ্য হচ্ছে to do আর সে কালে ছিল to be, এই দুই অবশ্য এক নয়।

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেছিলেন :—

"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্॥"

এ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যা বলিতেছেন, তার দুটি চারটি কথা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি :—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"

যে প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞ পুরুষের আদর্শ আমরা এতদিন শুধু সংস্কৃত পুস্তকেই প'ড়ে আস্‌ছি, মহাত্মা গান্ধীর চরিত্রে সেই আদর্শের যতটা সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছে, অপর কারও চরিত্রে ততটা পাওয়া যায় নি।

যাঁরা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তাঁর যে কোনও কর্ম্ম নেই, তা নয়, কিন্তু তাঁর কর্ম্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি আমাদের কর্ম্মের প্রেরণা ও পদ্ধতি নয়।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥"

এ সব কথা বল্‌বার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, মহাত্মা গান্ধী যে একজন আদর্শ পুরুষ. এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করেও নন-কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম কেবলমাত্র পলিটিকাল প্রোগ্রাম হিসেবে বিচার করার প্রবৃত্তি ও অধিকার আমাদের আছে।

এমন অনেক লোক দেখেছি, যাঁরা মনে করেন যে উক্ত প্রোগ্রাম রচনা করেছেন বলেই গান্ধী একজন মাহাত্মা। অপর পক্ষে আমার মতে মহাত্মা গান্ধীর প্রোগ্রাম বলেই জন-সাধারণের কাছে তার এত মাহাত্ম্য।

মহাত্মা গান্ধী যদি এর ঠিক উল্টো প্রোগ্রাম বার করতেন, অর্থাৎ non-violence-এর বদলে তিনি যদি violence প্রচার করতেন, তা হ'লে জন-সাধারণ তা প্রত্যাখ্যান করত, এমন কথা যদি কেউ মনে করেন, তা হ'লে তিনি স্থিতধী ব্যক্তির বশীকরণী শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

এ কথা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যেমন সত্য ছিল, আজও তেমনি সত্য রয়েছে। এক চুল এদিক্ ওদিক্ হয় নি।

আমার শেষ কথা এই যে, নন্-কো-অপারেশন সম্বন্ধে আমাদের যে মতভেদ রয়েছে, তার প্রকাশ সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ আমাদের চোখের সুমুখে রাখা উচিত, যদিচ আমরা জানি যে, তাঁর মত স্থিতধী হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। আমরা রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত নই। আমরা নির্ম্মমও নই, নিরহঙ্কারও নই। উপরন্তু আমাদের মনে শান্তি নেই, আছে শুধু অশান্তি। তবু উক্ত আদর্শ চোখের সুমুখে রাখলে আমরা ভয়ে মিথ্যে কথা বলতে ঈষৎ সঙ্কুচিত হব, এবং কথায় অসংযম ও অসৌজন্য দেখাতে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হব।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(Anti-Intellectualism.)

দু'খানি চিঠি। *

["কলিকাতা রিভিউ" কাগজে আমার লেখাটি পড়ে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে দু'খানি চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি সে দু'টি ছাপাতে দিচ্ছি। এ গুলি প্রবন্ধ নয়, চিঠি—এই কথাটি পাঠকেরা স্মরণ রাখবেন। আমার দুঃখ এই যে চিঠি থেকে গোটা কয়েক অবান্তর কথা বাদ দিতে গিয়ে সেগুলি প্রবন্ধের নতন দেখাচ্ছে—সম্পূর্ণতার রস, যা আমি উপভোগ করেছি, ইচ্ছা করে, সে রস সকলকে বণ্টন 'ক'রে দিই। এ ইচ্ছা কত স্বাভাবিক তা যিনি প্রমথ বাবুর চিঠি পেয়েছেন তিনিই জানেন।—শ্রীধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়]

* আমার যে দু'খানি প্রাইভেট চিঠি শ্রীযুত ধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায় নব্য ভারতে প্রকাশ করেছেন, সে দু'খানি সবুজ পত্রে পুনঃ প্রকাশিত করছি। এ দু'খানি যথার্থই পত্র, প্রবন্ধ যে নয়, তার প্রমাণ এ লেখার ভিতর দেদার ইংরাজী কথা আছে। বাঙলা লিখতে যদিচ আমরা ইংরাজি কথা একেবারে বাদ দিতে পারিনে, তবুও তার সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে চেষ্টা করি। শ্রীমান ধূর্জ্জটী Anti-intellectualism-এর বাঙলা করেছেন—"বুদ্ধিবাদের প্রতিবাদ"। যে বাদ শুধু প্রতিবাদ মাত্র, তা একটা নূতন বাদ নয়। যেমন protestantismও একটা নূতন ধর্ম্ম মত নয়। ইংরাজি ভাষায় বলতে গেলে, ও মত অদ্যাবধি negative মত হিসেবেই যে গণ্য, উপরোক্ত চিঠি দু'খানিতে তাই বলবার চেষ্টা করেছি। একমাত্র Intellect-এর সাহায্যে বিশ্বের সকল রহস্য যে উদ্‌ঘাটন করা যায়, কিম্বা মানব-জীবনের সকল ব্যাপারের যে ব্যাখ্যা করা যায়, এ বিশ্বাস আমার কস্মিন্ কালেও ছিল না, আজও নেই। আমার আর একটি কথা বলবার আছে। Reason কথাটার এ যুগে জাত গিয়েছে, ওর দোহাই দিতে সকলেই ভয় পায়; কিন্তু তার কারণ লোকে rationalismকে reason বলে ভুল করে। ওর প্রথমটি ত্যাগ করলেও, দ্বিতীয়টি মানুষে কখনো ত্যাগ করতে পারবে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(১)

ধূর্জ্জটী,

তোমার 'আর্টিকেল' পেলুম ও পড়লুম। লেখাটি একটু শক্ত হয়েছে, বিশেষতঃ সাধারণ পাঠকের পক্ষে ত নিশ্চয়ই। শক্ত হবার কারণ তুমি এক আর্টিকেলের ভিতর এমন অনেক জিনিষ ঢুকিয়েছ যার বিষয়ে অধিকাংশ লোক সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমাদের দেশের কজন লোক বলো ত "Regionalism", "Syndicalism" প্রভৃতির নাম শুনেছে? তবে তুমি বলতে পারো যে, এ প্রবন্ধ সকলের পড়বার জন্য নয়, সুশিক্ষিত পাঠকের জন্য। তার উত্তরে কিছু বলবার নেই। Anti-Intellectualism বুঝবে অবশ্য শুধু intellectualsরা।

এখন তোমার প্রবন্ধের আসল বিষয় সম্বন্ধে আমার একটী কথা বলবার আছে। ইউরোপে যত সব নূতন মত বেরিয়েছে তার ভিত্তি অবশ্য এই সত্য, যে মানুষ সুধু মস্তিষ্ক নয়; আর তার সকল কাজের গোড়ায় থাকে, তার প্রকৃতি, তার বুদ্ধি নয়। আর মানুষের প্রধান motive force হচ্ছে তার emotion, যা বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণ শাসিত হয় না আর শাসিত হওয়াও উচিত নয়। এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর Reason-এর পাণ্ডারা যে reason অর্থে intellect বুঝতেন এ কথা সম্ভবতঃ সত্য নয়। Anti-Intellectualism যে reason-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সে বিষয়েও কিন্তু সন্দেহ নেই। এখন আমার প্রশ্ন এই যে, এই সব Anti-Intellectualism-এর পাণ্ডারা sincere কি না? আমার বিশ্বাস আর্ট সাহিত্যের ক্ষেত্রে anti-Intellectualism অকপট, কেননা ও দুই জিনিষ

reason-এর সৃষ্টি নয়, কিন্তু পলিটিক্স্ ও ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ও একটা চাল মাত্র। পলিটিকাল হিসেবে massকে exploit করবার ও হচ্ছে একটা জবর উপায়। Pan-Slavism, Pan-Germanism প্রভৃতি সব যে, পলিটিকাল ব্যাপার, সে বিষয়ে ত কোনই সন্দেহ নেই; আর ও দুই ব্যাপারের সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয় আছে, তার থেকে দেখতে পাই, যে Slav আত্মা German আত্মা প্রভৃতির বিষয় যা বলা হয়, সে সব মিছে কথা, আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের মনে বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা। এ ব্যাপারের মূল হচ্ছে intellect। আজকাল লোক জানে যে intellect যার জন্ম দেয়—অর্থাৎ idea—তার সাহায্যে অপরের emotion জাগানো যায়, ওঠানো যায়, নাচানো যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি লিখেছ যে religion হচ্ছে মানব-সমাজের একটা প্রধান বন্ধন। কথাটা খুব সত্য। তাই ইউরোপে আজ অনেক স্বদেশী নেতা religion নিজে না মেনে অপরকে তা মানাতে চান, তাদের মনের উপর প্রভুত্ব করবার জন্যে। যে কাজ Church আগে করত, এরা আজ তাই করতে চাচ্ছে। এই কারণে ইউরোপে আজকাল একদল anti-intellectualist জন্মেছে যাদের নাম হচ্ছে—Atheist-Roman Catholic। আর্ট ও সাহিত্যে মানুষের উচ্চাঙ্গের emotion-এর প্রকাশ, আর পলিটিকস্ তার নিম্নাঙ্গের emotion-এর খেলা, সুতরাং এ দুই ক্ষেত্রে anti-Intellectualism এক জিনিষ নয় বরং ঠিক উল্টো জিনিষ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

Anti-Intellectualism-এর গলদ এই যে, তার উপর কোনরূপ সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলা যায় না। তোমার প্রকৃতি ও

আমার প্রকৃতি এক নয়, কিন্তু তোমাকে আমাকে যদি এক সঙ্গে ঘর কর্‌তে হয়, তা হ'লে তোমার সঙ্গে আমার প্রকৃতির যেখানে অনৈক্য তার উপর ঝোঁক না দিয়ে যেখানে ঐক্য সেইখানেই ঝোঁক দিতে হয়। আর মানুষের সঙ্গে মানুষের যাতে ঐক্য ঘটায় মনের সেই শক্তির নাম reason; ও জিনিষ মুখ্যতঃ moral এবং emotional এবং গৌণতঃ intellectual, সুতরাং anti-Intellectualism-এর একটা স্পষ্ট immoral ও un-emotional দিক আছে। যদি অনুমতি করত' একটা paradox বানাই। Anti-intellectualism-এর দোষ এই যে, তা ষোলআনা intellectual।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

(২)

ধূর্জ্জটী,

তোমার প্রথম চিঠি শনিবারে পাই, আর দ্বিতীয়খানি এইমাত্র পেলুম। তুমি দেখছি আমার কথাগুলো একটু বেশী seriously নিয়েছে। আমার চিঠির নীচে "বীরবল" সই থাকলে, আমার মতের কতটা রাখ্‌তে হবে আর কতটা ফেল্‌তে হবে, তা তুমি অনায়াসে ধরতে পারতে। ও চিঠিখানি আধমজা করে লেখা, তবে সে মজার ভিতর থেকেও এক আধটা সত্যও হয়ত বেরিয়ে পড়তে পারে। দেখ, সব দেশেই চলতি মতগুলো লোকমুখে ক্রমে বুলি হয়ে ওঠে। মানুষ একটা নাম পেলেই খুসি থাকে, তখন সে-নামের পিছনে রূপ দেখ্‌বার প্রবৃত্তি তার আর থাকে না। তারপর সেই নাম জপ্‌তে জপ্‌তে সে auto-hypnotised হয়ে যায়। যারা Folk-

Psychology লেখে, এ সত্য আমার বিশ্বাস, তারা নিশ্চয়ই ধরেছে।

ইউরোপের দশাই যখন এই, তখন আমরা যে বুলির দাস হয়ে পড়্‌ব তাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের মনের ভিতর সজ্ঞানে-গড়া এমন কোন মত নেই যা, কোনও নূতন মতের আক্রমণের বিরুদ্ধে ঢাল তল্‌ওয়ার নিয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের দেশের অবস্থা যা, আমাদের মনের অবস্থাও তাই, অর্থাৎ ও দুয়ের কোনটাই আত্মবলে রক্ষিত নয়। বিদেশীর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার ভার আজ যেমন ইংরাজের হাতে রয়েছে, নূতন মতের আক্রমণ থেকে মনকে রক্ষা করার ভারও আজ তেমনি ইংরাজের হাতে রয়েছে। এস্থলে ইংরাজ মানে, বিলিতি মত। আর বলা বাহুল্য যে, সে মত আমাদের হাতগড়া নয় বলে, আমাদের মনের উপর তা আলগা হয়ে বসে আছে;—যেমন দেশের উপর ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আলগা হয়ে বসে রয়েছে! সুতরাং ইউরোপ থেকে আমাদের পূর্ব্বার্জ্জিত মতের প্রতি আমাদের "মম-তা" নেই, তা ছাড়্‌তে আমরা সবাই সদাই প্রস্তুত। এই জন্যেই আমাদের critical বুদ্ধি আদপেই নেই। Conservatismই হচ্ছে criticismএর জন্মদাতা। পুরাতনকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য নতুনকে যাচাই করার নামই criticism। অবশ্য নূতনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্যও পুরাতনকেও মানুষে যাচাই করে—কিন্তু এ দুই হচ্ছে একই অস্ত্রের উল্টো প্রয়োগ। শেষটা কারও কারও হাতে ও অস্ত্র—"শঙ্খ বণিক করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে"—তাই হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ আমার হাতে criticism কতকটা ঐ রকম একটা যন্ত্র হয়ে উঠেছে। এ criticismএর কাজ কোনও বিশেষ মতকে রক্ষা করা কিম্বা নষ্ট করা

নয় ;—মতের ভিড়ের মধ্যে মনকে রক্ষা করা! এখন ইউরোপের উপর একটু নজর দেওয়া যাক্। ফরাসীরা যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল তার মূলমন্ত্র যে reason, এ কে অস্বীকার করবে, যখন উক্ত বিপ্লবের গুরু-পুরোহিতের দল নিজমুখে স্বীকার করেন যে তাঁরা age of reason আন্‌তে চেয়েছিলেন? আমার বক্তব্য শুধু এই যে, ও reason মানে intellect নয়। ও যুগের তিনটি মহাবাক্য—Liberty Equality Fraternity—intellect থেকে বেরয়নি, কেননা বেরতে পারে না। অসংখ্য জর্ম্মাণ পণ্ডিত দেখিয়েছেন যে উক্ত তিনটি কথা অতিশয় নির্ব্বোধের কথা। একমাত্র বুদ্ধির হিসেব থেকে তিনটির একটির পক্ষে দুটি ভাল কথা বলা যায় না। ও তিনটিরই মূল হচ্ছে মানুষের হৃদয় ও তার ন্যায়বুদ্ধি। Voltaire এর অস্ত্র, logic নয় irony, তর্ক নয় বিদ্রূপ। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান লোক ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর বুদ্ধিকে তাঁর moral senseএর অস্ত্র করে তুলেছিলেন। Voltaireএর বিদ্রূপের মারাত্মক শক্তির মূল হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর জ্বলন্ত রোষ। খৃষ্টান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে "Crush the infamy" বলা কি বুদ্ধিমানের কথা? এ হচ্ছে Churchএর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায়বুদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ। জর্ম্মান পাণ্ডিত্যপূর্ণ হাজার বইয়ের চাইতে Voltaireএর "Candide" এর মূল্য যে আজও শতগুণে বেশী তার কারণ শুধু তার wit নয়, সেই witএর পিছনে যে ন্যায়বুদ্ধি আছে তাই। Voltaire এর মতে ভুল idea হচ্ছে সকল অত্যাচারের মূল।

Rousseau যে কতবড় fool তা Maine পর্য্যন্ত অনায়াসে প্রমাণ করে দিতে পারেন। "Social Contract" যে উপন্যাস এ কথা

কোন ঐতিহাসিক না জানে? "Social Contract" লজিকের ঠাস বুনানি। কিন্তু ও বইয়ের সব axiom যে postulate—আর রুসো যে পাগল ছিলেন এ ত আমরা সবাই জানি। তবে কি গুণে এ পাগল দুনিয়া পাগল কর্‌লে? এক তাঁর অসাধারণ sensibilityর গুণে। রুসোর সকল মতের মূল হচ্ছে তাঁর হৃদয়।

সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে ফরাসী বিপ্লবের প্রাণশক্তি এসেছে ফরাসী জাতির হৃদয় ও ন্যায়বুদ্ধি থেকে। Heine মজা করে বলেছেন যে ফরাসী-বিপ্লব হচ্ছে একখানা মহাকাব্য। কিন্তু এ মজার ভিতর একটা মহাসত্য আছে। ইউরোপের যত কবির দল, Goete থেকে আরম্ভ করে Shelley পর্য্যন্ত ঐ ব্যাপারে মেতে উঠেছিলেন। আর যত intellectualএর দল, ফরাসী বিপ্লবের reason যে un-reason তাই প্রমাণ কর্‌তে কাগজের উপর কালির আঁচড় কাট্‌তে বসে গেলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর Enlightenment এর গলদ যে কোথায় তা বুদ্ধিমানের দল দুদিনেই লজিকের সাহায্যে ধরে ফেলবেন। ফল কথা ফরাসি বিপ্লবের ভিতরকার কথা, intellectualও নয় anti-intellectualও নয়, non-intellectual!

ও যুগের ফরাসী মনীষীরা humanityতে বিশ্বাস কর্‌তেন অর্থাৎ তাঁদের ধারণা ছিল মানুষমাত্রেই এক ছাঁচে ঢালা। তারপর, ফরাসী বিপ্লবের বিরুদ্ধে যখন re-action এলো, তখন বুদ্ধির দিক থেকে, ফরাসী মনের ঐ universalityর উপরই প্রধান আক্রমণ হল। তখন বলা হল যে মানুষ বলে কোনও পদার্থ নেই, আছে জর্ম্মাণ, ইংরেজ, দিনেমার, ওলন্দাজ ইত্যাদি। সুতরাং বস্তুগত্যা যা আছে তা হচ্ছে concrete, Universal একটা abstraction মাত্র। আর হৃদয়ের

দিক থেকে এই বলা হল idea চরিত্র গড়ে না। Voltaireএর ও বিশ্বাস বিলকুল ভুল, আসলে চরিত্র idea গড়ে। সুতরাং ideaরও কোন শক্তি নেই কোনও Universality নেই। এই দুই মত থেকে জন্ম লাভ করলে Romantic Movement; অতএব এ movement একদম concreteকে আঁকড়ে ধরলে। রোমাণ্টিক কবিতা পড়ো, দেখ্‌তে পাবে Feudalism ও খৃষ্টধর্ম্মের গুণকীর্ত্তিনে তা পূর্ণ, অর্থাৎ ঐ জাতীয় কাব্যের প্রাণ হয়ে উঠেছিল history. তারপর তা ইতিহাস থেকে পিছু হটে পুরাণ, ও পুরাণ থেকে পিছু হটে রূপকথায় গিয়ে পৌঁছল। ইতিহাস nationalistic হল, ইকনমিকস ঐতিহাসিক হল, আর্ট জাতীয় হল, দর্শন প্রথম হৃদয়ের ভিতর ঢুকে গেল, সেখানে বেশীদিন না থাকতে পেরে তারপর willএর উপর ভর করলে, তারপর unconscious অর্থাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ল। তারপর রোমাণ্টিসিজিমের মৃত্যু হল। রোমাণ্টিসিজিমের ভুল এই যে concreteএর পূজা কর্‌তে কর্‌তে সে Universalকে ভুলে মেরে দিলে। আর emotionকে মুখের কথায় বাড়াতে বাড়াতে তা sentimentalismএর সৃষ্টি কর্‌ল।

তারপর এই রোমাণ্টিসিজিমের প্রতিবাদ স্বরূপে Realism এর জন্ম হল। এ জিনিষ হল একদম বৈজ্ঞানিক। এর মূলসূত্র হল এই যে, বুদ্ধি, ন্যায়বুদ্ধি, হৃদয় এর কোনটিই মানুষের চরিত্রের ও কর্ম্মের নিয়ন্তা নয়, natureই তাকে চালায়, সে nature কতকটা বাহ্য-প্রকৃতি, কতকটা তদনুরূপ মানুষের অন্ত প্রকৃতি। মানুষের মূল প্রকৃতি খুঁজতে খুঁজতে এরা instinct বার করে ফেলেছে—অর্থাৎ এমন একটা ভিতরকার ঠেলা, যা হৃদয় মনের অধীন নয়।

Conscious মন হচ্ছে উপকার মন—তার ভিতর যা আছে সে হচ্ছে ego-instinct, sex-instinct ও group-instinct; আর মানব-জীবন হচ্ছে এই তিনের খেলা। এ সত্য অবশ্য মানুষের analytic-intellect এর কাছে ধরা পড়েছে। এই জন্যই আমি বলেছি যে anti-Intellectualism হচ্ছে Intelleclualismএর শেষ কথা। এখন দেখা যাক এর ফল দাঁড়াল কি।

বলা বাহুল্য মানুষ কর্ম্ম-মার্গেরও পথিক আর জ্ঞান-মার্গেরও পথিক; মানুষ শুধু কাজ করে খুসি হয় না, সে সকল বিষয়ের তত্ত্বও জানতে চায়। New Psychology, Folk-Psychology যদি সত্য হয় ত তাতে মানুষের জ্ঞান বাড়িয়ে দিয়েছে। Einsteinএর আবিষ্কারকে কালই আমরা ফলিত-জ্যোতিষে পরিণত কর্‌তে পার্‌ব না, কিন্তু তাই বলে তাঁর যে কোনও মূল্য নেই তা নয়। সুতরাং New Psychologyর সাহায্যে Psycho-Analysis না কর্‌তে পারলেও, আর Folk-Psychologyর সাহায্যে Folk-lore বানাতে না পারলেও, ও দুয়ের Science অর্থাৎ জ্ঞান হিসেবে যথেষ্ট মূল্য আছে। যে হেতু মানসিক দূরবীনের সাহায্যে Folk-Psychology আর অনুবীক্ষনের সাহায্যে New Psychology আবিষ্কৃত হয়েছে; সেইজন্য ওর একটার চেষ্টা হচ্ছে মানুষের মনের ভিতর যা অতি ক্ষুদ্র বা অতি সূক্ষ্ম তাকেই মানব-মনের ভিত্তি করা, আর অপরটির বহুমানবের মধ্যে যা অতি স্থূল তাকেই উক্ত মনের ভিত্তি করা। বলা বাহুল্য এ দুই বিজ্ঞানই মানুষের personalityকে উড়িয়ে দেয়।

তারপর ঐ জ্ঞানের হিসেব থেকে দেখলে দেখা যায় যে জর্ম্মান

Romanticism আর ফরাসি Humanitarianism হচ্ছে পরস্পর পরস্পরের thesis ও anti-thesis ; কাজেই এ যুগে, দুইয়ে মিলে synthesis হয়েছে। আজকের দর্শনের শেষ কথা এই যে, Concreteএর মধ্যেই Universal থাকে। Concrete থেকে ছাড়িয়ে নিলে, universal যেমন একটা abstraction মাত্র হয়ে পড়ে, Universal থেকে ছাড়িয়ে নিলে Concreteও তেমনি একটা abstraction মাত্র হয়ে ওঠে, কেননা Concreteও থাকে Universalএর মধ্যে। সুতরাং Intellectualismও যেমন ভুল anti-Intellectualismও তদ্রূপ ; তবে ও দুয়ের মধ্যেই আধখানা করে সত্য আছে। ফরাসীরা দিয়েছিল Humanityর উপর ঝোঁক, আর জর্ম্মানরা দিয়েছিল Nationalityর উপর ঝোঁক। একের ফলে ঘটেছিল French Revolution আর অপরের ফলে হয়েছে German War। ফরাসী বিপ্লবের ফলে সুধু ফরাসী জাত নয়, বিশ্বমানব নবজীবন লাভ করেছিল, আর জর্ম্মান যুদ্ধের ফলে সুধু জর্ম্মান জাত নয় বিশ্বমানব মৃত্যুমুখে পড়েছে। অতএব আমার বিশ্বাস, মানুষ আবার Humanitarianism-এর উপর ঝোঁক দেবে, সুধু বাঁচবার জন্য। Anti-Intellectualism জর্ম্মান রোমাণ্টিসিজিমের গোঁয়ার ছেলে, সুতরাং এ যুগে তার প্রতিপত্তি আর বেশী দিন থাক্‌বে না। কারণ মানুষ এখন সমগ্র মানব সমাজের একটা Spiritual synthesis চায়। এবং তার জন্য চাই Reason, যে হেতু ও জিনিস হচ্ছে, হৃদয়, মন ও ন্যায় বুদ্ধির synthesis। ইতি—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বর্ষা

—:*:—

এমন দিনে কি লিখ্‌তে মন যায় ?

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি যে, যে দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়্‌ছে, সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায় অথচ এত স্থূলও নয় যে তা' চোখ জুড়ে থাকে, আর কানে আস্‌ছে তার একটানা আওয়াজ—সে আওয়াজ কখনো মনে হয়, নদীর কুলুধ্বনি কখনো মনে হয় তা' পাতার মর্ম্মর ;—আসলে তা' একসঙ্গে ও দুই-ই ; কেন না আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর, দুই মিলে মিশে এক সুর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষ যে অন্যমনস্ক হয়, তার কারণ তার সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ-পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখে কি যে অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয়, তা' বাঙ্গালী মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোন পাখীর পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগা-গোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তারপর চেয়ে দেখি গাছপালা, মাঠঘাট সবারই ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণের আনন্দে

নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দুলছে আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনো বা এলিয়ে পড়ছে, কখনো বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পাতার চাপে যে সব গাছের ডাল দেখা যায় না, সে সব গাছের পাতার দল এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে; কখনো বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকে চুরে এমন আকার ধারণ করছে যে দেখলে মনে হয়—বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিকজল পান করছে। আর এই খাম-খেয়ালি বাতাস নিজের খুসিমত একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতাপাতাকে নাচিয়ে দিয়ে, বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তার স্পর্শে যা কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত, সে সবই প্রথমে কেঁপে উঠবে, তারপর ব্যতিব্যস্ত হবে, তারপর মাথা নাড়বে তারপর হাত পা ছুঁড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক আর তার মুখে সিৎকার। বৃষ্টির সঙ্গে, বৃক্ষপল্লবের সঙ্গে, সমীরণের এই লুকোচুরি খেলা আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে পেতে শুনছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোন ভাবনা চিন্তা নেই, আছে শুধু এমন একটা অনুভূতি, যার কোন স্পষ্ট রূপ নেই, কোন নির্দ্দিষ্ট নাম নেই।

মনের এমন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কি লেখা যায়? যদি যায় ত সে কবিতা, প্রবন্ধ নয়।

আনন্দে বিষাদে মেশোনা ঐ অনামিক অনুভূতির জমির উপর অনেক ছোটখাট ভাব মুহূর্ত্তের জন্য ফুটে উঠছে, আবার মুহূর্ত্তেই তা' মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের কাছে গুণ্ গুণ্ করছে, কত কবিতার শ্লোক, কখনো পুরোপুরি

কখনো আধখানা হ'য়ে আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যে সব কবিতা, যে সব গান আজ আমার মনে পড়ছে সে সবই হয় সংস্কৃত, নয় বাঙলা, নয় হিন্দি।

"মেঘৈর্মেদুরম্বরম্ বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ—গীতগোবিন্দের এই প্রথম চরণ যে বাঙালী একবার শুনেছে চিরজীবন সে আর তা' ভুলতে পারবে না। আকাশে ঘনঘটা হলেই তার কানে ও চরণ আপনা হ'তেই বাজতে থাকবে। সেই সঙ্গে মনে পড়ে যাবে মনের কত পুরোণো কথা, কত লুকানো ব্যথা। আমি ভাবছি মানুষ ভাষায় তার মনের কথা কত অল্প ব্যক্ত করে, আর কত বেশী অব্যক্ত রয়ে যায়। ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করবার জন্যই যাঁরা এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁরাও, অর্থাৎ কবির দলও, আমার বিশ্বাস, তাঁদের মনকে অর্দ্ধেক প্রকাশ করেছেন, অর্দ্ধেক গোপন রেখেছেন। আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের একটি পুরোণো গানের প্রথম ছত্রটি ঘুরে ফিরে ক্রমান্বয়ে আমার কানে আসছে—এমন দিনে তারে বলা যায়। এমন দিনে যা বলা যায় তা' হয়ত রবীন্দ্রনাথও আজ পর্য্যন্ত বলেন নি, সেক্সপিয়ারও বলেননি। বলেন যে নি, সে ভালই করেছেন। কবি যা' ব্যক্ত করেন তার ভিতর যদি এই অব্যক্তের ইঙ্গিত না থাকে, তা' হ'লে তাঁর কবিতার ভিতর কোনও mystery থাকে না, আর যে কথার ভিতর mystery নেই, তা কবিতা নয়, পদ্য হ'তে পারে।

সে যাই হোক্, আজ আমার কানে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানের সুর লেগে নেই, সেই সঙ্গে তিনি বর্ষার যে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন, সেই সব চিত্র বায়োস্কোপের ছবির মত আমার চোখের সুমুখ দিয়ে একটির পর আর একটি চলে যাচ্চে। ভাল কথা—এটা কখনো ভেবে

দেখেছেন যে, বাঙ্‌লার বর্ষা রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন—ও ঋতুর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের ভারতী ভরপুর; তার ভীম মূর্ত্তি আর তার কান্ত মূর্ত্তি, দুই-ই তাঁর চোখে ধরা পড়েছে; দুই-ই তাঁর ভাষায় সমান সাকার হয়ে উঠেছে? নবাবী আমলের বাঙালী কবিরা এ ঋতুকে হয় উপেক্ষা করেছেন, নয় তাকে তেমন আমল দেন নি। চণ্ডিদাসের কবিতায় কি বর্ষার স্থান আছে? আমার ত তা' মনে হয় না। হয়ত বীরভূমে সেকালে বৃষ্টি হ'ত না, তাই তিনি ও ঋতুর বর্ণনা করেন নি। বাকী বৈষ্ণব কবিরাও এ বিষয়ে একরূপ নীরব। অবশ্য ঝড় বৃষ্টি না হলে অভিসার করা চলে না, সুতরাং অভিসারের খাতিরে তাঁদের কাব্যেও মেঘ-বজ্র-বিদ্যুতের একটু আধটু চেহারা দেখাতে হয়েছে; অর্থাৎ ও ক্ষেত্রে বর্ষা এসেছে নিতান্ত আনুসঙ্গিক ভাবে। অবশ্য এ বিষয়ে সেকালের একটা কবিতা আছে যা একাই একশ'—

"রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে॥
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে॥" ইত্যাদি

সঙ্গীত হিসেবে এ কবিতা গীতগোবিন্দের তুল্য, আর কাব্য হিসেবে তার অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

এখন আমার কথা এই যে, আজ আমার মনের ভিতর দিয়ে যে সব কথা আনাগোনা করছে, সে সব এতই বিচ্ছিন্ন, এতই এলোমেলো, যে সে সব যদি ভাষায় ধরে তারপর লেখায় পুরে দেওয়া যায়, তা

হলে আমার প্রবন্ধ এতই বিশৃঙ্খল হবে যে, পাঠক তার মধ্যে ভাবের গোলক ধাঁধায় পড়ে যাবেন। বাইরের law and orderকে আমরা যতই বিদ্রূপ করি, ভাবের law and orderকে না মান্য করে আমরা সাহিত্য ত মাথায় থাক্, সংবাদ পত্রও লিখ্‌তে পারি নে। আর যদি এমন পাঠকও থাকেন, যিনি বাঙ্‌লা দেশের ছেলে-ভুলান ছড়া-পাঁচালির অনুরূপ অসম্বন্ধ গদ্য রচনা, মনের সুখে পড়তে পারেন, তা হলেও আমি আজ মন খুলে লিখ্‌তে প্রস্তুত নই। অনেক কথা যা আজ মনে পড়ছে, তার যা কিছু মূল্য আছে, তা আমার কাছেই আছে, অপর কারও কাছে নেই। বহুকাল-মৃত, বহুকাল-বিস্মৃত, কোনও শুক্‌নো ফুলের পাঁপ্‌ড়ি যদি হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়, তা হলে যে সেটিকে এককালে সজীব অবস্থায় সাদরে সঞ্চিত করে রেখেছিল, একমাত্র তারই কাছে সে শুষ্ক পুষ্পের মূল্য আছে, অপরের কাছে তা বর্ণগন্ধহীন আবর্জ্জনা মাত্র। মানুষের স্মৃতির ভিতরও এমন অনেক শুক্‌নো ফুল সঞ্চিত থাকে, যা অপরের কাছে বার করা যায় না। কিন্তু এমন দিনে তা আবিষ্কার করা যায়।

আবার ঘোর করে এল; বাতি না জ্বালিয়ে লেখা চলে না, আর কালির অপব্যয় করা যত সহজ বাতির অপব্যয় করা তত সহজ নয়। অতএব এইখানেই এ লেখা শেষ করি। ইতি

বীরবল।

আমাদের ভাষা-সঙ্কট *

দিন তিনেক আগে একখানা চিঠি পাই, তাতে পত্রলেখক আমার কাছে জানতে চেয়েছেন যে citizen শব্দের বাঙলা কি? তিনি একখানি হিন্দি বইয়ে নাকি দেখেছেন, যে "জানপদ" "নাগরিক" ও "পৌরজন" এই তিনটি শব্দই citizen এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ও তিনটীর মধ্যে কোনটি গ্রাহ্য এই হচ্ছে তাঁর জিজ্ঞাস্য। আমি উত্তর দিয়েছি যে, যদি কোনটি হয় ত শেষটি।

প্রকৃতিবাদ অভিধানে দেখতে পাই যে, "জনপদের" অর্থ, দেশ, বসতিস্থান ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ কোষকার চাণক্যের এই বচনটি তুলে দিয়েছেন—"গ্রামং জনপস্য অর্থে"। villager এবং citizen অবশ্য পর্য্যায়-শব্দ নয়।

'নাগরিক" শব্দের সঙ্গে বিলাস ও বৈদগ্ধ্যের যোগ অতি ঘনিষ্ট তাই নাগরিক অপভ্রষ্ট হয়ে বাঙলায় নাগর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব ও শব্দ পলিটিক্সে চলবে না, ও পতিতকে কংগ্রেসও উদ্ধার করতে পারবেন না, ওকে আর সহসা সাহিত্যের জাতে তোলা যাবে না।

বাকি রইল এক পৌরজন। "পৌরজন বলতে আমরা পাড়া-গেঁয়েও বুঝিনে, ইয়ারও বুঝিনে। ও শব্দের সঙ্গে মূর্খতার কিম্বা

* শঙ্খ হইতে উদ্ধৃত।

দুষ্টতার কোনও যোগাযোগ নেই। সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য ও-পদ লম্বা করবার দরকার নেই। সে সাহিত্যে শুধু পৌরই চলে। কিন্তু পৌরের পিছনে, "জন" এই লেজুড় জুড়ে না দিলে আমাদের মন খুসি হয় না, কেন না, আমরা চাই citizen এর পুরো প্রতিধ্বনি।

উপোরোক্ত তিনটি শব্দের একটিও কিন্তু বাঙলা নয়, তিনটিই অটুট সংস্কৃত। সুতরাং citizenএর বাঙলা কি—এ প্রশ্নের উত্তর করা হল না।

তারপর citizenএর অনুবাদ সংস্কৃতেও করা যায় না। ও শব্দের জন্ম রোমে। আর পুরাকালে রোমক পত্তনে citizen বলতে যা বোঝাত, খুব সম্ভব পৌরজন বলতে অতীত ভারতবর্ষে তা বোঝাত না। প্রথমতঃ রোমের পুরবাসী মাত্রেই citizen ছিল না—পরে রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত সর্ব্বলোক রোমের citizen হয়ে উঠেছিল; তা তারা সে সাম্রাজ্যের যে ভুভাগে, যে গণ্ডগ্রামেই বাস করুক না কেন! এই থেকেই দেখা যাচ্ছে যে, পৌরজন বলায় citizenএর প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না।

citizenএর পরিচয়, পুরে পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে পলিটিক্সে। যে ব্যক্তি কতকগুলি বিশেষ পলিটিকাল সত্বে সত্ববান সেই citizen, অপরে নয়। বর্ত্তমান ইউরোপের সকল ভাষাতেই citizen বলতে ব্যক্তি বিশেষের পলিটিকাল মর্য্যাদার পরিচয় পাওয়া যায়। কি বাঙলা, কি সংস্কৃত, কোন অভিধানে উক্ত শব্দের যে প্রতিশব্দ নেই, তার কারণ পলিটিক্স শব্দের প্রতিশব্দও আমাদের ভাষায় নেই।

বাঙলায় পলিটিক্‌স লেখবার বাধা ত ঐখানেই। পলিটিক্‌স লেখা মানে, বিলেতি পলিটিক্‌স অনুবাদ করা। আর উপযুক্ত কথার অভাবে আমরা হয় তা অনুবাদ করতে পারিনে, নয় তার ধাতু ধরে এমন সব নূতন সংস্কৃতশব্দ তৈরি করি, মনে মনে ইংরাজিতে পুনরনুবাদ না করে নিলে, যার অর্থ বোঝা যায় না। কখনো বা হাতের গোড়ায় যা মেলে, আমরা নির্ব্বিচারে সেই সংস্কৃত শব্দ টেনে নিই, তা তার আসল অর্থ যাই হোক না কেন। আমাদের সাহিত্যে, সংবাদ পত্রে যে সকল বিদেশী পলিটিকাল মনোভাব সংস্কৃত-ভাষার ছদ্মবেশ পরে বেড়াচ্ছে, সে পোষাকে তাদের বিলেতি চেহারা ঢাকা পড়ে না, শুধু যে বিকৃত হয়ে যায়, তা গোটাকতক উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ট দেখানো যেতে পারে।

politicsএর বাঙলা করেছি আমরা রাজনীতি, বলা বাহুল্য যে, গ্রীক পলিটিক্‌সের অর্থ রাজার নীতি নয়। যে আথেন্সে ও কথার জন্ম সেখানে রাজা ছিল না, ছিল Republic, তাই আরিস্টটলের politics আর প্লেটোর Republic একই বিষয়ের দুটি বিভিন্ন মীমাংসা, আসলে ওর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমাজ বেদের পূর্ব্ব মীমাংসা। আর প্রথমটি উত্তর মীমাংসা। তারপর "রাজনীতি" শব্দ আমার বিশ্বাস সংস্কৃত ভাষায় নেই, যদি কোথাও থাকে ত গা-ঢাকা দিয়ে আছে। ও বস্তুর যথার্থ সংস্কৃত নাম হচ্ছে "নীতি"। আর নীতি ব'লতে Statecraft বোঝায়—পলিটিক্‌স বোঝায় না। "রাজনীতি" শব্দ আমরা নিজে বানিয়েছি বলেই যে তা অগ্রাহ্য তা অবশ্য নয়; ওর দোষ এই যে ও কথায় পলিটিক্‌সের অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। ঐ কথার প্রসাদে পলিটিকসের নাম শোনবামাত্র আমাদের চোখ

রাজার উপরে পড়ে এবং সেই খানেই আবদ্ধ থাকে। কিন্তু ইউরোপীয় হাল পলিটিক্‌সে রাজার স্থান হয় এক কোণে, আর না হয়ত মোটেই নেই। Bolshevism পলিটিক্‌সের অন্তর্ভূত কিন্তু রাজনীতির নয়।

তারপর আমাদের পলিটিক্‌সের সব চাইতে বড় কথা Nation শব্দের আমরা বাঙলা করেছি জাতি। কিন্তু জাতি শব্দে Raceও বোঝায়, casteও বোঝায়, classও বোঝায়, creedও বুঝায়—অর্থাৎ শুধু বিভিন্ন নয়, উল্টো উল্টো অর্থও বোঝায়। এই ধরুণ না কেন, ইউরোপে Nation শব্দ যে মনোভাব প্রকাশ করে, Caste তার ঠিক উল্টো মনোভাব প্রকাশ করে। আর nation শব্দ যে ইউরোপীয় তার প্রমাণ, ওর ঠিক প্রতিশব্দ স্বভাষায় খুঁজে না পাওয়ায়; আমরা ওটিকে জাতিতে পরিণত করেছি। একদল ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতে, Nation-এর বসতি মানুষের মনে, বাইরে নয়, ও বস্তু subjective, objective নয়। যদি এ মত সত্য হয়, ও আমার বিশ্বাস তা পুরো সত্য, তাহলে বলা বাহুল্য যে nation—জাতি হতে পারে না। কেননা জাত অন্তত এদেশে এতটা স্পষ্ট objective যে, তার অস্তিত্ব নির্ভর করে স্পর্শের উপর। untouchability যে হিন্দু-সমাজের অ-জাতেরই ধর্ম্ম—তা কে না জানে। যে কথার পাঁচরকম বিভিন্ন অর্থ আছে, ও কোনও কোনও স্থলে পরস্পর বিরোধী অর্থ আছে—সে কথায় যে মনের ভিতর পাঁচমিশেলি মনোভাব নিয়ে আসে—আর তার ফলে—আমাদের সকল কথন সকল লিখন যে ঘোলাটে মেরে যায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে?

আমাদের বিশ্বাস বিলেতি ভাব—সংস্কৃত ভাষায় পুরে দিলেই তা বাঙলা হয়। পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে, non-violent non-co-operation-এর কেউ কেউ বাঙলা করেছেন—"নিরুপদ্রব-সহযোগিতা-বর্জ্জন"। এরূপ অনুবাদ যে বাঙলা ভাষার উপর উপদ্রব, এ বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই। সমগ্র ইউরোপে একরকম আইন প্রচলিত আছে, যার নাম Private International Law। জনৈক বাঙালী অধ্যাপকের হাতে উক্ত বাক্য কি আকার ধারণ করে জানেন? "গুপ্ত আন্তর্জাতিক ব্যবহার শাস্ত্র"। উক্ত আকার যে কিম্ভূতকিমাকার তা বলাই বাহুল্য। তারপর এই ভাষান্তরিত বাক্যের দোষও অনেক। প্রথমত ও বাক্য কাণে সয় না, দ্বিতীয়ত ওর মানে হয় না, তৃতীয়ত ও বাক্য বাঙলাও নয়, সংস্কৃতও নয়; ওর গুণের ভিতর এই যে ওটি ইংরেজীর খুব গা-ঘেঁষা। "গুপ্ত আন্তর্জাতিক ব্যবহারশাস্ত্র" ও "নিরুপদ্রব সহযোগিতা-বর্জ্জন" এ দুইই একই তরজমার কলে তৈরি—আর দ্বিতীয়টি যে বাঙলা-ভাষার ভিতর খাপ খেলে না, তার প্রমাণ ঐ আধহাত লম্বা সমাসটি আপনা হতেই সঙ্কুচিত হয়ে "অসহযোগিতায়" দাঁড়াল। তারপর—ওর চাইতেও ছোট, ওর চাইতেও অপরিচিত শব্দ, "নৈযুজ্য"ও, আমি নিজ কাণে লোককে ব্যবহার করতে শুনেছি। কিন্তু এ দুয়ের একটিও যে non-co-operation-এর বাচক তা ভরসা করে বলা যায় না। বাঙলায় যদি ওর অনুরূপ কথা না পাওয়া যায় ত, আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত সাহিত্যে খুঁজলে তা পাওয়া যেতে পারে।

সে যাই হোক অসহযোগ যে, অমনোযোগের অনুবাদ, কথাটার প্রতি একটু মনোযোগ করলেই তা ধরা পড়ে। co-operation,

non-co-operation বলতে addition, subtraction, বোঝায় না, সুতরাং যোগ-বিয়োগে ওর হিসেব মিলবে না। যোগ-বিয়োগ হয় শুধু সংখ্যার। কিন্তু operation হচ্ছে একটি ক্রিয়া। আমার মনে হয়, "সহযোগিতা" না বলে "সহকারিতা" বললে co-operation-এর ভাবার্থ অনেকটা পাওয়া যায়। ও অনুবাদ অনুসারে co-operator হচ্ছেন "সহকারী", আর ওর আগে "আলেফ" কিম্বা "বে" যা লাগিয়ে দিন তাতেই non বোঝাবে। "সহযোগী ও "সহকারী" যে এক বস্তু কি এক ব্যক্তি নয়, তা সংবাদ পত্রের সম্পাদক মাত্রেই জানেন। তাঁরা "সহযোগী" বলেন এমন বস্তুকে অর্থাৎ এমন কাগজকে—যার সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগ নেই, আর সম্পাদকের সহকারী হচ্ছে তাঁর দক্ষিণ হস্ত। আমার অনুবাদ গ্রাহ্য করলে সকলেই দেখতে পাবেন যে "সহকারী" ও "সরকারী" অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাবে, আর ও দুটিকে মেলালে একটি পদ্য হয়।

আমার অনুবাদ যদি কারও মনঃপূত না হয়, তাহলে তার চাইতে ভাল অনুবাদ বার করুন। ভুল অনুবাদের দোষ এই যে, তাতে মানুষের মনে ভুল ধারণা জন্মায়। পলিটিক্‌সের খেলা "জোড় কি বিজোড়ের" নয়, জোর কি বিজোরের খেলা।

এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, বিলেতি পলিটিক্‌সের, ওরফে আমাদের শাসন-সংক্রান্ত সকল ইংরেজি-শব্দের বৃথা অনুবাদ করে, আমাদের সময় নষ্ট করবার দরকার নেই। জিনিষ যদি স্পষ্ট হয় আর তার নাম যদি ছোট হয় ত, সে নাম নিজগুণে ও স্বরূপে বাঙলার ভিতর ঢুকে ও বসে যাবে—যেমন টেক্স আর পুলিশ বসে গিয়েছে। আর যে সব শব্দ বাঙলার গায়ে সইবে না, সে সব শব্দের অনুবাদ না

করে তার অনুরূপ শব্দ বাংলা সংস্কৃত থেকে খুঁজে বার করতে হবে।

আমাদের এ যুগের পলিটিক্‌সে এমন একটি কথা এসেছে যে একাধারে স্বপ্রকাশ ও প্রাণবন্ত। "স্বরাজ" শব্দ যে সেই জাতের একটি কথা যা মানুষের ভিতরে বাইরে যুগান্তর আনে, তার একটি কারণ এই যে, ও শব্দ কোনও ইংরাজি কথার অনুবাদ নয়। Home Rule-এর অনুবাদ হয়ত আমরা করতুম "গৃহশাসন", আর Dominion Self-Government-এর কি যে করতুম তা আমি ভেবে পাই নে। বিপিন বাবুকে জিজ্ঞেস করলে হয়ত তিনি বলতে পারেন। অপর পক্ষে "স্বরাজ" বলতে কি বোঝায় তা আমরা সবাই মনে মনে জানি। আর এও জানি যে স্বরাজের ইংরেজি অনুবাদ হয় না।

স্বরাজ ব্যক্তিগত কি জাতিগত, এ নিয়ে বাদানুবাদ শুনেছি। এ বাদানুবাদের মূল এই যে, ও শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যক্তির দখলেই ছিল। যতদূর জানি সংস্কৃতে স্বারাজ্য ও স্বরাট আছে—স্বরাজ নেই। স্বারাজ্য বলতে দেশেরই এক প্রকার রাজ্য বোঝায়। কিন্তু স্বরাট বিশেষণ আমাদের শাস্ত্রে বিশেষ করে ভগবানকেই বিশিষ্ট করে। প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের এই প্রথম ছত্র—

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্।"

আমার মতে জাতির স্বরাজ্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বরাজ্যের কোনও বিরোধ নেই, মূলত ও দুই এক। ভগবান যখন সুধু অন্বয়ে নয়—ব্যতিরেকেও আমাদের সকলের ভিতর আছেন, তখন প্রতি ব্যক্তির স্বরাট হবার বাসনা বলেই তার ব্যক্তিগত স্বরাজ্য লাভ হয়,—আর তার অনুরূপ সাধনার ফলে জাতিও তার স্বারাজ্য অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব

লাভ করে। আর এক কথা, ব্যক্তির উপরেই জাতি নির্ভর করে, সুতরাং ব্যক্তির স্বরাজ্য নষ্ট ক'রে জাতির স্বরাজ্য গড়ে তোলা যায় না। ব্যক্তি একদিকে যেমন জাতিতে লীন হয়ে যায় না; আর একদিকে ব্যক্তি তেমনি জাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়। বাইরে থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, ব্যক্তি জাতির ভিতরে আছে, আবার ভিতর থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় যে, জাতি ব্যক্তির ভিতরে আছে। সংক্ষেপে মানুষের ব্যবহারিক আত্মা অন্বয় ব্যতিরেকে সমাজ ও ব্যক্তি দুয়ের ভিতরই বর্ত্তমান। সুতরাং ইহলোকে সে মুক্তি মুক্তিই নয় যা, যুগপৎ ব্যক্তি ও সমাজের মুক্তি নয়। "স্বরাজ" শব্দে, মানুষের উভয়মুখী মুক্তি বোঝায় বলেই ও শব্দের এত শক্তি। ও শব্দের এই মন্ত্রশক্তি হচ্ছে দৈবীশক্তি অর্থাৎ সৃষ্টিকরী শক্তি। স্বারাজ্য ও স্বরাট এই দুয়ে মিলেই স্বরাজ হয়েছে—তাই তার এত অর্থগৌরব।

যাক্ এ বিষয়ে আর বেশী বকব না। কেননা দেখতে পাচ্ছি আমার বাঙলা ক্রমে জর্ম্মান হয়ে উঠছে। অতএব এ লেখা এখানেই শেষ করি। আমার আর বিশেষ কিছু বলবারও নেই। আমার গোড়ার কথা যা, আমার শেষ কথাও তাই। আমরা আর পাঁচরকম সঙ্কটের সঙ্গে ভাষা-সঙ্কটেও পড়েছি। আর তার থেকে উদ্ধার পাবার উপায় হচ্ছে, সঙ্কটে যে পড়েছি, এ বিষয়ে সজ্ঞান হওয়া। এ সত্য কি সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, ভাষা-সঙ্কট থেকে উদ্ধার না পেলে আমরা ভাব-সঙ্কট থেকেও উদ্ধার পাব না। আর মনই যদি আকষ্ট-বন্ধে পড়ে থাকল ত মুক্তি পাবে কে? দেহ?

১৮ই মে, ১৯২২। বীরবল।

আমাদের ভাষা-সঙ্কট *

(২)

শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে আমার ভাষা সঙ্কর; অর্থাৎ আমার বাঙলার ভিতর থেকে ইংরেজী শব্দ স্ব-রূপে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এ অপবাদ সত্য। তবে বাঙলার ভিতর ইংরেজী ঢুকলে ভাষা যদি সঙ্কর হয়, তাহলে সুধু আমার নয়, দেশ-শুদ্ধ লোকের ভাষা সঙ্কর হয়ে গেছে।

বাঙলার ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথপোকথনের দিকে কান দিলেই টের পাবেন যে, তাদের মৌখিক ভাষার বিশেষ্য বিশেষণ সব বেশীর ভাগ ইংরাজি, তার ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামই সুধু বাঙালা। তার পর জনগণের মুখেও যে কত ইংরাজি কথা "তদ্ভব" আকারে নিত্য চলছে তা সে শ্রেণীর বাঙালীর সঙ্গে কার্য্যগতিকে যাঁর নিত্য কথা-বার্ত্তা কইতে হয় তিনিই জানেন। রাজমিস্ত্রি ছুতোরমিস্ত্রিদের অধিকাংশ যন্ত্রপাতির নামের যে বিলেতে জন্ম তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—কেন না মিস্ত্রি কথাটাই বিলেতি। "বিলেতি" শব্দের অর্থ বিদেশী। আমি তাই ও শব্দটা "ইউরেপীয়" এই অর্থেই এ পত্রে ব্যবহার করছি, ইংরাজির প্রতিশব্দ হিসেবে নয়।

ইংরাজি কথা যেমন হালে আমাদের ভাষার ভিতর প্রবেশ করেছে, ইংরাজ রাজা হবার পূর্ব্বে অপর নানা জাতীয় বিলেতি

* বিজলী হইতে উদ্ধৃত।

কথা, তেমনি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ভাষার ভিতর অবলীলাক্রমে ঢুকে গেছে, আর বাঙলা ভাষার অঙ্গে সে সব এমনি বে-মালুম ভাবে বসে গিয়েছে যে, সে গুলি যে আসলে বিলেতি তাও আমারা ভুলে গিয়েছি। পশ্চিম ইউরোপের ভাষাগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, প্রথম Romance language দ্বিতীয় Germanic। এখন দেখা যাক এ দুয়ের ভিতর কোন ভাষার কাছে আমাদের মুখের ভাষা বেশী ঋণী।

নবাবী আমলের কবি, ভারতচন্দ্রের মুখে শুনতে পাই যে তাঁর কালে বাঙলায় এই সব বিলেতি জাতি বাস করত, যথা—(১) ফিরিঙ্গি (২) ফরাসি (৩) আলেমান (৪) ওলন্দাজ (৫) দিনেমার (৬) ইংরাজ। ফরাসি অবশ্য French, আলেমান German, ওলন্দাজ Dutch, দিনেমার Dane, আর ইংরাজ English, তাহলে ফিরিঙ্গি হচ্ছে নিশ্চয়ই পর্ত্তুগিজ; French ফিরিঙ্গি না হয়ে পর্ত্তুগিজ যে কেন তা'হল সে রহস্যের সন্ধান আমি জানিনে। শব্দের রূপান্তরের আইন কানুন আমি জানিনে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সব জাতের চাক্ষুষ পরিচয় ছিল। তিনি বহুকাল ফরাসডাঙ্গায় বাস করেছিলেন, আর পোর্ত্তুগিজদের আড্ডা ছিল হুগলি, ওলন্দাজদের চুঁচুড়া, দিনেমারদের শ্রীরামপুর, সব শেষ ইংরেজদের কলিকাতা। মধ্য থেকে আলেমান কোত্থেকে এসে জুটল আর তাদের বসতিই বা ছিল কোথায়—তা আমার অবিদিত। ফরাসডাঙ্গায় যে জার্ম্মানরা ছিল না, সেটা নিশ্চিত; আর কলিকাতায় যে ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে সেকালে কোন জাতের সঙ্গে অপর কার যে entente cordiale ছিল সে কথা আমি বলতে

পারিনে; যেহেতু আমি ঐতিহাসিক নই। আমার বিশ্বাস আলেমানরা তখন আশমানে বাস করত, অর্থাৎ তারা সর্ব্বত্রই ছিল।

উল্লিখিত ছটি জাতের মধ্যে প্রথম দুটির ভাষা—Romance বাকী চারটির Germanic। এই Romance ভাষার দেদার কথা বাঙালীর অজ্ঞাতসারে বাঙলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। বহুকাল পূর্ব্বে "সাহিত্য-পরিষদ্ পত্রিকায়" বাঙলার অঙ্গীভূত পোর্ত্তুগিজ শব্দাবলীর একটি ফর্দ্দ দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে যায়, কেননা সে ফর্দ্দ ছিল দশপাতা লম্বা। তারপর আমাদের ভাষায় ফরাসি শব্দও বড় কম নেই। তাস খেলার "জুয়ো" থেকে আরম্ভ করে প্রমারার "দুস" "ত্রেস" "তেরাস্তা" "কোরেস্তা" "মাছ" "কাতুর" পর্য্যন্ত প্রায় সকল কথাই ফরাসি। ঐ সূত্রে দেখতে পাই জার্ম্মানিক ভাষারও দুচার কথা আমাদেব ভাষায় ঢুকে গিয়েছে। শুনতে পাই "হরতন" "রুইতন" হচ্ছে খাস ওলন্দাজী। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নবাবের আমলে দু হাতে বিলেতি কথা আত্মসাৎ করে' বাঙলা-ভাষা তার দেহ পুষ্ট করেছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, বিদেশী শব্দকে স্বদেশী করা হচ্ছে আমাদের ভাষার চিরকেলে ধর্ম্ম।

মুসলমান যুগে কত ফারসি ও আরবি শব্দ যে বাঙালা হয়ে গেছে তা কি আর বলা প্রয়োজন? আমরা হচ্ছি কৃষীজীবী জাত অথচ "জমি" থেকে ফসল" পর্য্যন্ত কৃষি-সংক্রান্ত প্রায় সকল কথাই হয় ফারসি নয় আরবি। আর জমিদারীসংক্রান্ত, সকল কথাই ঐ আরবি ফারসির দান, ও ভাষার ভিতর সংস্কৃতের লেশ মাত্র নেই। আমাদের কর্ম্মজীবনের যা ভিত্তি অর্থাৎ দেশের মাটি তারও নাম জমি। বাঙলার মত মিশ্র ভাষা এক উর্দ্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর

দ্বিতীয় নেই। তারপর আমাদের কর্ম্ম জীবনের যা চূড়া অর্থাৎ আইন আদালত, তার ভাষাও আগাগোড়া আরবি ফার্সি। আরজি, থেকে রায় ফরসালা পর্য্যন্ত মামলার আদ্যোপান্ত সকল কথাই বাঙলাভাষাকে মুসলমানের দান। ইংরাজরা আজকাল ডিক্রী দেন বটে কিন্তু তা "জারি" করতে হলেই ইংরাজি ছেড়ে ফার্সির শরণাপন্ন হতে হয়। এ কথা যে সত্য, তা যে কোনও মোক্তারী সেরেস্তার আমলা হলপ করে বলবে।

(৩)

পরের ধনে পোদ্দারি করা হচ্ছে, যখন বাঙলাভাষার চিরকেলে বদ অভ্যাস, তখন এ যুগে যে তা অসংখ্য ইংরাজি শব্দ সুধু মুখস্থ নয় উদরস্থও করবে, সে ত ধরা কথা। এতে বাঙলা ত তার স্বধর্ম্মই পালন করে চলেছে। তবে আমাদের ভাষার, পরকে আপন করার স্বভাবের বিরুদ্ধে, আজ কেন আপত্তি উঠেছে? এর একটি কারণ, পূর্ব্বে বাঙলাভাষা বিদেশী শব্দ বেমালুম আত্মসাৎ করেছে; অপর পক্ষে আজ তার এই চুরি বিদ্যেটা এক ক্ষেত্র সহজেই ধরা পড়ে। সেকালে বাঙলা মুসলমানদের কাছথেকে কর্ম্মের ভাষা নিয়েছিল, পোর্ত্তুগিজ ফরাসীদের কাছথেকে নিয়েছিল সুধু জিনিষের নাম, আর আজ আমরা ইংরাজি থেকে ও দুই জাতীয় কথা ত নিচ্ছিই, উপরন্তু তার জ্ঞানের ভাষাও আত্মসাৎ করছি। প্রথম দুইটির ব্যবহার হচ্ছে লৌকিক আর শেষটির সাহিত্যিক, লৌকিক কথার চুরিকে চুরি বলে ধরা যায় না, কেননা তার ভিতর অসংখ্য লোকের হাত আছে, ও হচ্ছে সমাজিক আত্মার কাজ, ওর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা চলে না। অপর

পক্ষে সাহিত্যিকচৌর্য্য, ব্যক্তি-বিশেষের কাজ অতএব সেটা ধরাও যায় ও সে কথাচোরকে শাসন করাও যায়।

(৪)

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবেন যে উক্ত লৌকিক ও সাহিত্যিক চুরি, উভয় ব্যাপারেরই মূলে আছে একই গরজ।

মুসলমানরা আমাদের দেশে যে সব নতুন কছমের, আদালত কাছারি আইন কানুন এনেছে তাদের সঙ্গে তাদের বিদেশী নামও এসেছে। এবং সেই আইন আদালত যেমন সমাজের উপর চেপে বসেছে, তাদের নামও তেমনি ভাষার ভিতর ঢুকে বসেছে।

"ফিরিঙ্গিরা" যে সব নতুন জিনিষ এ দেশে নিয়ে এসেছে আর আমাদের ঘরে ঘরে যার স্থান হয়েছে তাদের নামও আমাদের মুখে মুখে চলেছে। "তাস" হিন্দুরা খেলত না, তারা খেলত পাশা, মুসলমানরাও খেলত না, তারা খেলত হয় "সতরঞ্চ" নয় "গঞ্জিফা"। "ফিরিঙ্গিরা" যখন দেশে তাস আনলে তখন শুধু "বিন্তি" নয় "প্রমরা" খেলতেও আমরা শিখলুম, ফলে ফরাসি কথা "জুয়ো" বাঙলা হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে জুয়ো খেলিয়ে বাঙালীরা ফরাসীতে যাকে বলে "জুয়ারি" তাই হয়ে উঠল।

এ যুগে ইংরাজেরা আমাদের অনেক জিনিষ দিয়েছে, যা আমাদের ভাষায় স্বনামে ও আমাদের ঘরে স্বরূপে আছে ও থেকেও যাবে। একটা সর্ব্বলোকবিদিত উদাহরণ দেওয়া যাক। বোতল গেলাস বাঙলা ভাষা থেকে কখনো বেরিয়ে যাবে না, কেননা ও দুই চিজও বাঙলা দেশ থেকেও কখনো বেরিয়ে যাবে না। বাঙলা যদি একদম

বেসুরা হয়ে যায়, তাহলেও বাঙালীরা ওষুধ খাবে, আর মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্য তেল মাখবে। অতএব আমাদের কাঁচের পাত্র চাই।

তারপর ইংরাজ প্রবর্ত্তিত নূতন কর্ম্মজীবনও "তৎসম" অবস্থায় না হোক "তদ্ভব" অবস্থায় থেকে যাবে। আর সে কারণ বাঙলা ভাষায় সে জীবনের বিলেতি নাম সব, "তৎসম" রূপে না হোক "তদ্ভব" রূপে বজায় থাক্‌বে।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ইংরাজি জ্ঞানের ভাষাও কতক পরিমাণে বাঙলা ভাষার অন্তরঙ্গ হয়ে থাক্‌বে। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে অনেক নূতন জ্ঞান, অনেক নূতন ভাব আমাদের মনের ভিতর ঢুকে গিয়েছে তাই তাদের বিলেতি নামও আমাদের মুখে মুখে চলেছে। যেহেতু দেশের জনগণ ইংরাজি শিক্ষিত নয়, সে কারণ ঐ সব ইংরাজি কথা স্বল্পসংখ্যক লোকের মুখেই শোনা যায়; আর তাদের বিদেশীধ্বনি আমাদের কানে সহজেই ধরা পড়ে। আর সেই কারণেই বাঙলা ভাষা থেকে অনেকে চান "আইডিয়াকে" গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে।

বাঙালীর মুখ থেকে বিলেতি কথা কেউ খসাতে পারবেন না, অতএব সে চেষ্টা কেউ করেনও না। আমরা চাই শুধু লিখিত ভাষায় বিদেশী শব্দ বয়কট করতে। কিন্তু আমাদের এই সাত শ বছরের বর্ণসঙ্কর ভাষাকে যদি আবার আর্য্য করতে হয়, তাহলে ভাষার আর্য্য-সমাজীদের আগে সে ভাষাকে শুদ্ধ করতে হবে, তার পরে তার পৈতে দিতে হবে।

এ চেষ্টা বাঙলায় ইতিপূর্ব্বে একবার মহা বাক্যাড়ম্বরের সঙ্গে হয়ে গেছে। ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিত মহাশয়েরা যে গদ্য রচনা করে গিয়েছেন তাতে ফার্সি আরবীর স্পর্শ মাত্র নেই। তাঁদের ঐ

তিরস্করণী বুদ্ধির প্রতাপে বাঙলাভাষা থেকে শুধু যে আরবী ফার্সি বেরিয়ে গেল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য "তদ্ভব" কথাও সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত হল। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙলা সাহিত্যে কারও "বিয়ে" করবার সাধ্য ছিল না, সকলেই বিবাহ করতে বাধ্য হত। আর বিবাহ করেও কারও নিস্তার ছিল না, কেননা ও সাহিত্যে স্ত্রীকে কেউ "ভালবাসতে" পারত না সকলকে তার সঙ্গে "প্রণয় করতে" হত। শুধু অসংখ্য কথা যে বেরিয়ে গেল তাই নয়, ভাষার কল-কব্জাও সব বদলে গেল। "দ্বারা", "সহিত, কর্ত্তৃক", "পরন্তু", "অপিচ", "যদ্যপিস্যাৎ" প্রভৃতির সাহায্য ব্যতীত উক্ত সাধু ভাষায় পদ আর বাক্য হতে পারত না। ফলে বাঙালীর মুখে যা ছিল active বাঙালীর লেখায় তা passive হয়ে পড়ল। বাঙলা ভাষার উপর এই আর্য্য অত্যাচার বাঙালী যে বেশিদিন সহ্য করতে পারে নি, তার সাক্ষাৎ প্রমাণ স্বরূপ ষাট বৎসর আগে বাঙালীর ওড়ানো বিদ্রোহের দুটি লাল পতাকা আজও আমাদের সাহিত্য গগনে জ্বলজ্বল করছে। "আলালের ঘরের দুলাল" আর "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" যে বাঙলা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

পণ্ডিত মহাশয়েরা যখন বাঙ্গলা ভাষার যবন দোষ ঘোচাতে পারেন নি তখন আমারাও তা পারব না,—কেননা আমাদের আধুনিক সাহিত্যের, সংস্কৃত বেশধারী বহু শব্দকে আঁচড়াইলেই তার ভিতর থেকে আহেল বিলেতি ভাব বেরিয়ে পড়ে। "আইডিয়া" বাদ দিয়ে বাঙলা আজ আমরা কেউ লিখতে পারিনে। অতএব আমার নিবেদন এই যে, কোনও নতুন বিদেশী কথাকে বয়কট করা কিম্বা পুরোণো বিদেশী শব্দকে বাঙলা ভাষা থেকে বহিষ্কৃত করবার চেষ্টা

করা, শুধু বৃথা সময় নষ্ট করা। আমাদের ভাষায় অনেক নতুন কথা আপনা হতেই ঢুকবে আর অনেক পুরোণো কথা আপনা হতেই বেরিয়ে যাবে, আর তা হবে তাদের জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে।

এ পত্রের যবনিকা পতনের পূর্ব্বে আর একটি কথা বলব। এ সত্যটা এখন ধরা পড়েছে যে, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীর ভাষা নয়। বংশে বাঙালী হচ্ছে মঙ্গল-দ্রাবিড়, আর তার ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতের প্রপৌত্রী, "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি" বাঙলার আদিম অধিবাসীরা "তথা" স্বভাষা ত্যাগ করে মাগধী প্রাকৃত গ্রহণ করেছিল। সেই দিন থেকে এ দেশের লোকের মনেরও পুনর্জন্ম হয়েছে কেননা মন আর ভাষা একই জিনিষ। আমরা যদি এখন বিশুদ্ধ বাঙলা ভাষায় ফিরে যেতে চাই তাহলে আমাদের ফিরতে হবে আদি-দ্রাবিড়+আদি মঙ্গল ভাষায়; কিন্তু সে ভাষাও হবে সঙ্কর।

বাঙালী যে দেহে সঙ্কর, মনে সঙ্কর, ভাষায় সঙ্কর—এর জন্য দোষী আমরা নই, কেননা বাঙালী জাতি আমাদের সৃষ্টি করেছে, আমরা বাঙালী জাতিকে সৃষ্টি করিনি।

এই জাতিভেদের দেশে বাস করে, শুধু দেহে নয় মনেও ছুঁতমার্গী হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক—তবে এই মিশ্রণের জন্য দুঃখ করা বৃথা; কেননা ওপাপ নিজের দেহ মন থেকে দূর করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায়, বাইরের জিনিষকে আত্মসাৎ করা যে প্রাণের লক্ষণ, নব-আয়ুর্ব্বেদের এই মতকে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাই ভাল।

২৪শে জুন, ১৯২২। বীরবল।

৺সত্যেন্দ্রনাথ *

—:*:—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।" এ উপদেশের আধখানা অধিকাংশ লোক কিছুতেই গ্রহণ করবে না। আর বাকী আধখানা দেবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বিদ্যাচর্চ্চা মানুষে স্বেচ্ছায় করে না, অতএব সে চর্চ্চা যত শিগ্‌গীর পারে তত শিগ্‌গীর মানুষে ত্যাগ করতে উৎসুক। অপর পক্ষে অর্থচিন্তা মানুষে শ্মশান পর্য্যন্ত করে—আর তা নিজেকে অমর জ্ঞানই করে।

(২)

আমরা সবাই জানি যে, আমাদের জীবনের একদিন শেষ হবে, কিন্তু সে দিনটে আমরা মনে মনে সকলেই নিত্যই পিছিয়ে দেই। এ ব্যাপারে আমাদের মনগড়া মুলতবির আর অন্ত নেই। আসল কথা মৃত্যু জিনিসটিকে আমরা ভুলে থাকতে চাই। মানুষ যাকে কাজ বলে তা হচ্চে মৃত্যুকে ভোলাবার উপায় না হলেও, ভোলবার একটা উপায়। মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে থাক্‌তে চায় বলেই, অর্থোপার্জ্জন হচ্ছে অধিকাংশ লোকের মতে পৃথিবীতে একমাত্র কর্ম্ম—অপর সকল কর্ম্ম যথা বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতি; ঐ মূল কর্ম্মের যোগাড়ি কর্ম্ম মাত্র।

* বিজলী হইতে উদ্ধৃত।

(৩)

নিজের মৃত্যুর তারিখ পিছিয়ে দেবার প্রবৃত্তিবশতঃ আর কতকটা মানব-জীবনের অভিজ্ঞতাবশতঃ মানুষে, মানুষের পরমায়ু বলে একটা কাল্পনিক জিনিসের সৃষ্টি করেছে, আর মৃত্যুরও একটা স্বাভাবিক নিয়মের অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। তাই অকাল মৃত্যু ও অপমৃত্যু মানুষের মনকে বিশেষ করে বিচলিত করে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অবধি তাঁর কথা আমার দিবারাত্র মনে পড়ছে। আমাদের মত স্বল্পায়ু জাতির হিসেবেও তাঁর মৃত্যু যে অকাল-মৃত্যু সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

(৪)

আয়ুর অঙ্কের হিসেব ছেড়ে দিলেও, প্রাণের অর্থের হিসেব থেকেও এ মৃত্যু সত্য সত্যই অকালমৃত্যু। বাঙলার নব কবিদের মধ্যে তাঁর আসন যে সর্ব্বোপরি ছিল, এত সর্ব্বজনবিদিত সত্য। এ আশা আমাদের সকলের মনে ছিল যে, তাঁর প্রতিভা ক্রমে পরিপক্কতা লাভ করবে এবং তিনি বঙ্গসাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবেন। কালক্রমে তাঁর কবিত্ব-শক্তির কোনরূপ হ্রাস হয়নি এবং তিনি আমরণ যে অজরামরবৎ বিদ্যাচর্চ্চা করবেন এ বিষয়েও তাঁর বন্ধুবর্গ সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যুতে বঙ্গ-সরস্বতীর বীণার এমন একটি পাকা তার হঠাৎ ছিঁড়ে গিয়েছে, যা আমার বিশ্বাস অপর কেউ সহসা চড়াতে পারবেন না। বাঙলা ভাষা যাঁর স্পর্শে স্বতঃই এমন বিচিত্র ছন্দে মূর্ত্ত হয়ে উঠত যে, তাঁর অভাব অপর কেউ

সহজে পূরণ করতে পারবে না। আর দ্বিতীয় সত্যেন্দ্রনাথ যে কালই জন্মগ্রহণ করবেন এরূপ আশা করা বৃথা।

(৫)

আজকের দিন, তাঁর কবিতার আলোচনা করবার ঠিক দিন নয়। যাঁরা তাঁকে জানতেন, তাঁদের চোখের সুমুখে আজ কবি সত্যেন্দ্রনাথ ততটা নেই, যতটা রয়েছেন মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ। তাঁর মত মিতভাষী লোক আমাদের এই বাচাল জাতের মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায়। আমি নিজে তাঁকে কখনো তর্কে যোগ দিতে দেখিনি, যদিচ তাঁর সুমুখে কখনো কখনো আমরা মহা উত্তেজিত ভাবে ঘোর তর্ক করেছি। কিন্তু তাঁর মুখাকৃতি ও তাঁর সংযত ব্যবহারের ভিতর থেকে, তাঁর চরিত্রের সরলতা ও উদারতা স্বতঃ প্রকাশিত হয়ে পড়ত। তিনি বাঙলা সাহিত্যের একজন অদ্বিতীয় গুণী ছিলেন অথচ তাঁর কথায় তাঁর ব্যবহারে আমি অহঙ্কারের লেশমাত্রও কখনো লক্ষ্য করি নি। তাঁর এই নিরহঙ্কার চরিত্র আমাকে চিরদিনই মুগ্ধ করেছে।

(৬)

তাঁর এই সহজ বিনয়ের স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যেত যে, তাঁর প্রকৃতিতে আর যে জিনিষেরই অভাব থাক্, শক্তি ও দৃঢ়তার অভাব ছিল না। আমার বিশ্বাস যে তাঁর ছন্দের মত তাঁর চরিত্রেও দুর্ব্বলতার কোনও স্থান ছিল না। যার ভিতর কাঠিন্য গুণ নেই তা কখনো পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে না, তা সে জড়পদার্থই হোক্, ভাষাই হোক্, ভাবই হোক। কাঠিন্য যে একটা

গুণ, বিশেষত মনের, একথা হয়ত অনেকের কানে অদ্ভুত ঠেক্‌বে। আমরা ভালবাসি মনের নরম ভাবকে, আর ভয় করি গরম ভাবকে। কিন্তু যা নরমও নয়, গরমও নয়,— কিন্তু কেবলমাত্র কঠিন, তার আদর আমরা করিনে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ— আমার কথার মর্ম্ম বুঝতেন, কেননা তিনি নিজেই বলেছেন যে—

"কঠিনা! কে বলে তোরে হেয় ?
নির্ভর—কঠিন হওয়া শ্রেয়।"

(৭)

আমরা এ যুগে, মানসিক ও সামাজিক এত প্রকার অসত্য ও অন্যায়ের ভিতর বাস করি, এত প্রকার মিথ্যাচার ও অত্যাচারের দ্বারা আমাদের হৃদয় মন বিড়ম্বিত হয়,—যে, যে-বাণীর ভিতর বিদ্রোহের সুর নেই—সে বাণী অলোকসামান্য হলে আমাদের মনকে হয় ত চমৎকৃত করতে পারে, কিন্তু আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। সত্যেন্দ্রনাথের গদ্য পদ্যের ভিতর থেকে, যা অসত্য, যা অশিব, যা অসুন্দর, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের একটি তীব্র সুর ফুটে উঠত। তিনি সুধু কবি ছিলেন না, সেই সঙ্গে ছিলেন আমাদের যুগ-ধর্ম্মের একজন শক্তিমান সৈনিক। তাঁর হাতে বাঙলা ভাষা যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি ভাস্বর আগ্নেয়াস্ত্র হয়ে উঠত। সুতরাং তাঁর মৃত্যুতে, সুধু বাঙলার সরস্বতীর বীণার যে একটি প্ল্যাটিনামের তার ছিঁড়ে গিয়েছে তাই নয়, বাঙলার দশভুজার হাতেরও একটি দিব্যাস্ত্র খসে গিয়েছে।

(৮)

কবি তাঁর প্রথম যৌবনে সমীরণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

হে সমীর! তোল তবে উৎসাহের তান,
বিশ্ব যেন রহে সচেতন।
আমিও তোমার সনে গাব সমস্বরে,
যতদিন না আসে মরণ।
আমি গেলে—দেখ' দেখ'
এ গান জাগায়ে রেখ'—
মিলনের সঙ্গীত মহান!
নবোৎসাহ সঞ্চারিয়া—দিয়ো নব প্রাণ।

কবি তাঁর কথা রেখেছেন। "যতদিন না আসে মরণ" তিনি সমীরণের সঙ্গে সমস্বরে অবিরাম গান গেয়ে গিয়েছেন,—আশা করি, বায়ুদেবতার কাছে তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। তাঁর কবিতায় বায়ুর অর্থ অবশ্য প্রাণ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বুল-দ্য-সুইফ বা চর্ব্বির গোলা *

(Manpassant-র ফরাসী হইতে)

আজ কয়েকদিন ধরে পরাজিত সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সহরের ভিতর দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল। লড়াকে-সেপাহীর মত চেহারা তাদের আর কিছুমাত্র ছিল না—ছিন্ন ভিন্ন হয়ে এক একটা দল বেঁধে তারা চলছিল। লম্বা বেজায় নোঙ্‌রা দাড়ি আর ছেঁড়া পোষাক, এই নিয়ে গাঁ-ছেড়ে দিয়ে তারা এগোচ্ছিল, সঙ্গে না ছিল নিশান, না ছিল তাদের পল্টনী কায়দা। সকলেরি অতি ক্লান্ত, বিমর্ষ ভাব দেখে মনে হয় তারা চিন্তা বা কাজ করবার শক্তি একদম হারিয়েছে; হাঁটছে শুধু অভ্যাসের বশে, কোথাও থামলেই ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়ছে। আরও চোখে পড়ছে হরেক রকমের লোক যারা সবে নূতন যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাদের মধ্যে ছিল অনেক শান্ত শিষ্ট, নিরীহ, আধাবয়সী লোক, যারা বন্দুকের ভারে নুইয়ে পড়ছে; আর চট্‌পটে ছোকরা সৈনিক যারা সহজেই যেমন রোখে তেমনি ভয় খায়,

---

* এটি মোপাসাঁর প্রথম গল্প এবং এই গল্প লিখেই তিনি জগৎবিখ্যাত লেখক হয়ে ওঠেন। যখন এ গল্প লেখা হয়, তখন ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান যুদ্ধের জের মেটে নি। অর্থাৎ তখন ফরাসীরা যুদ্ধে হেরেছে আর জর্ম্মাণরা অর্দ্ধেক ফ্রান্স দখল করে বসেছে। এই গল্পের বইটি দেশের ঐ দুরবস্থার দিনেও এক মাসে নাকি তিন লক্ষ কপি ফ্রান্সে বিক্রী হয়।

আক্রমণ করতে ও পালাতে যারা সমান পটু; লাল কোর্ত্তা পরা দু' একজন সেপাহী, বড় বড় লড়াইয়ে ঘা খেয়ে যাদের দলের মধ্যে সামান্য সংখ্যাই বেঁচে আছে; গম্ভীর মুখ গোলন্দাজ সেপাহী পদাতিকদের সাথে দণ্ডায়মান, আর কচিৎ এক আধটি জমকালো পোষাক পরা অশ্বারোহী সেপাহী, যারা সাজ সজ্জার ভার বয়ে অতি কষ্টে পদাতিক সৈন্যের সাথে চলছে।

এদের পর ফিরে এল কয়েক দল ভলাণ্টিয়ার সৈন্য, চোরের মত চেহারা করে। কিন্তু তাদের নামগুলো ছিল খুবই গাল-ভরা—"পরাজয়ের প্রতিহিংসক", "মৃত্যুদেশের মানুষ", "মরণের সহযাত্রী" ইত্যাদি।

এই সব দলের কাপ্তেন হচ্ছেন রাজ্যের যত বুড়ো হাবড়া কাপড়ের ও গোলদারী ব্যবসায়ী, চর্ব্বি ও সাবানের ভূতপূর্ব্ব দোকানী। সেপাহী হয়েছেন তাঁরা দায়ে পড়ে, আর কাপ্তেন হয়েছেন পয়সার জোরে বা গোঁফের বহরের জোরে। হাতিয়ার-পাতি, ফ্লানেল ও লেসে সজ্জিত হয়ে, জোর গলায় তারা কথা কইছিলেন, যুদ্ধের যুক্তি পরামর্শ করছিলেন,—এই ভাবে যেন যুদ্ধক্লিষ্ট ফ্রান্সকে তাঁদের কাঁধে চাপিয়ে, শুধু গলাবাজির জোরেই তাঁরা বাঁচিয়ে রাখছেন। কিন্তু মনে মনে তাঁরা আপনাদের অধীন সৈন্যদের বিশেষ ভয় করে চলতেন, কারণ তারা সব ছিল কারামুক্ত কয়েদী, দুঃসাহসিক-চোর ও বদমাইস।

তারা সবাই বলাবলি করছিল, প্রুসীয়ানরা রুয়াঁ প্রবেশ করল বলে।

বাকী ছিল ন্যাশনাল গার্ডের সৈন্যরা। তারা মাস দুই ধরে আশ

পাশের বন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে খুব হুঁসিয়ার হয়ে খবরদারী করছিল,—কখন বা নিজ প্রহরীদের উপর গুলি চালিয়ে, কখন বা ঝোপের আড়ালে একটা খরগোসের বাচ্চা নড়লেই বন্দুক উঁচিয়ে যুদ্ধং দেহি বলে বুকটান করে খাড়া হয়ে। কিন্তু তারাও বাড়ী ফিরে এসেছে। তাদের যন্ত্রপাতি, পোষাক-আষাক, মানুষ ত ভাল, রাস্তার থামগুলোর পর্য্যন্ত ত্রাস জন্মিয়ে দিত। তারাও হঠাৎ অন্তর্হিত হয়েছে।

অবশিষ্ট ফরাসী সৈন্যেরা সেন নদী পার হয়ে চলে এল, "সাঁৎ-সেভে" ও "বুর্গ আসাদ" দিয়ে "পঁৎ ওদেমে" যাবার জন্য। সকলের শেষে এলেন ভগ্ন-হৃদয় সেনাপতি, দু'জন গোলন্দাজ অফিসারের সাথে, পায়ে হেঁটে। আপনার ছত্রভঙ্গ, দড়িছেঁড়া সৈন্যের উপরে তাঁর কোন ক্ষমতাই ছিল না; তিনি নিজেও অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন,—চিরকাল যুদ্ধজয়ী একটা জাতের অতুল সাহস সত্ত্বেও এই সাংঘাতিক পরাজয় ও ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে।

তারপর বিরাট নিস্তব্ধতা; ভয়ঙ্কর কি একটার প্রতীক্ষায় সব চুপ, সহরটা ছমছম করছে। হাঁদাপেটা যত দোকানীরা, ব্যবসাতে শুধু টাকা করতে গিয়ে যাঁরা সাহসটুকুও হারিয়েছেন—তাঁরা যে কোন মুহূর্ত্তে বিজেতারা এসে পড়ে তাই ভাবছেন, আর তাঁদের মনে বিশাল ভয় যে রান্নাবান্নার ছুরি বঁটিগুলোকে শেষটা জর্ম্মাণরা অস্ত্রের মধ্যে না ধরে।

প্রতিদিনকার চলাফেরা বন্ধ, দোকান পাট বন্ধ, রাস্তা ঘাট কোলাহল শূন্য;—কদাচিৎ এক আধটি লোক চারদিকের এই নিস্তব্ধতায় ভয় খেয়ে দেয়ালের গা ঘেঁষে সরে পড়েছে।

অবশেষে এই অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠল, এর চেয়ে শত্রুর উপস্থিতি ও ভাল বলে মনে হল।

ফরাসী সৈন্য চলে যাবার পরদিন বিকেলে কোথা থেকে একদল uhlan দ্রুতগতিতে সহরের উপর দিয়ে চলে গেল। এর কিছু পরেই "স্যাঁৎ কাথেরিনের" দিক থেকে এক দল সৈন্য শ্রাবণের আকাশ ভাঙ্গা কালো মেঘের মত নেমে এল এবং "দারনেটন" ও "বোয়াস যুই লোঁ"-এর পথ ধরে আরও দুই বিজয়ী বাহিনী এসে উপস্থিত হল। এই তিন দলের অগ্রবর্ত্তী প্রহরী সৈন্য একই সময়ে "হোটেল-দ্য-ভিলের" সুমুখে এসে জড় হল! তারপর চারদিককার সব-গুলো পথ দিয়ে তালে তালে পল্টনী পা ফেলার শব্দে রাস্তার পাথর মুখরিত করে, বিজয়ী জার্ম্মান সৈন্য অবিরাম চলে যেতে লাগল।

অজ্ঞাত, দাঁতভাঙ্গা এক ভাষায় উচ্চারিত, অফিসারদের সব আদেশ পথের ধারের সব বাড়ীগুলোর উপর থেকে শোনা গেল। বাইরে থেকে বাড়ীগুলো দেখতে পরিত্যক্ত, মৃত,—কিন্তু বন্ধ করা জালনার আড়াল থেকে জোড়া জোড়া চোখ দেখছিল, কেমন ওরা দেখতে এই বিজয়ী মানুষ গুলো, যারা যুদ্ধে জয়লাভ করবার অধিকারে এই—সহরের মালিক, জীবন মরণের হর্ত্তা কর্ত্তা, সকল স্বত্বে সত্ত্ববান। দরজা জালনা বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে বসে সহরের তাবৎলোক আতঙ্কে কাঁপছিল, যেমন করে মানুষ কাঁপে যখন পৃথিবী ধ্বংসকারী প্রলয়ের রুদ্রমূর্ত্তি তার চোখের সুমুখে প্রকাশিত হয়, যার বিরুদ্ধে তার সব বাহুবল, সব যুক্তিতর্ক একেবারে ব্যর্থ। যখনই পৃথিবীতে অনেকদিনের চলে-আসা একটা গোছ-গাছ, অভ্যস্ত একটা শৃঙ্খলা ও চারদিকের শান্তি, যখনই মানুষ বা প্রকৃতির হাতে গড়া সাধারণ

দৈনন্দিন জীবন যাত্রার আয়োজন অনুষ্ঠান, বিবেক শূন্য নির্ম্মম বর্ব্বরতার পায়ের তলায় দলিত হয় তখনই এমনতর বুক ভাঙ্গা আতঙ্ক সবাইকে চেপে ধরে। মানুষে-ভরা আস্ত আস্ত বাড়ীগুলো যখন পৃথিবীর দুলুনীতে আছাড় খেয়ে সবশুদ্ধ ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে; নদীর বাণ যখন দুই কুল প্লাবিত করে জলে ডোবা কৃষকদের মৃতদেহ, মরাগরু ও ঘরের কড়ি বরগা একসাথে ভাসিয়ে নিয়ে যায়,—অথবা বিজয়ী সৈন্য যখন জীবন রক্ষার জন্য যারা যুদ্ধ করে; তাদের কতক মেরেকেটে, কতক বন্দী করে, তরবারির জোরে লুট করে ও কামান গর্জ্জনের সাথে তাদের দেবতার জয়ধ্বনি করে চলে যায়,—তখন আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হয় তাকে ভক্তি বলা চলে না। এ সব দৃশ্যে, ঈশ্বরের সুবিচারের উপর আমাদের বিশ্বাস, তাঁর উপর আমাদের ভক্তি ও নির্ভর এবং মানুষের উপর আমাদের আস্থা —সবগুলো শিকড় শুদ্ধ আমাদের মন থেকে উপড়ে ফেলে দেয়।

যাক্। সৈন্যদের এক একটা দল প্রত্যেক বাড়ীর কাছে গিয়ে তার দরজায় একটা করে ঘা দিলে, তারপর ভিতরে ঢুকে গেল। প্রথমে আক্রমণ, তারপর দখল। এর পরের কর্ত্তব্য হচ্ছে বিজিত-দের;—তারা জেতাদের সাথে কুটুম্বের মত ব্যবহার করবে।

কয়েকদিন যেতেই লোকের ভয়টা ভেঙ্গে গেলে একটু শান্তির মত দেখা গেল। অনেক বাড়ীতে প্রুসীর অফিসার পরিবারবর্গের সাথে এক টেবিলে খেত। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ভদ্রবংশীয়; তারা ভদ্রতা করে, ফ্রান্সের উপর সহানুভূতি দেখিয়ে বলত যে, আন্তরিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। এই ভদ্রতার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হত, কারণ সময়ে তাদের সাহায্য নেওয়া আবশ্যক

হতে পারে। অনেকের খোরাক জুটে যেত এই ভবিষ্যৎ চিন্তার দরুণ। আর যার উপর তাদের ভাল মন্দ নির্ভর করছে, তাকে চটিয়েই বা লাভ কি? ও রকম কাজে সাহস নয়, অসমসাহসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। এককালে "রুয়াঁ"বাসীরা প্রাণপণে শত্রুকে বাধা দিয়ে অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল বটে, এখন আর সে দিন নেই। বিশেষতঃ এটাও একটা কথা যে, ফরাসী ভদ্রতার সদ্বুদ্ধি বশতই সকলে মেনে নিত যে, লোকে বাইরে ঐ বিদেশী সৈন্যগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা না দেখালেও, ভিতরে তাদের সাথে অবাধেই মিশতে পারে। রাস্তায় তারা কেউ কারো দিকে ফিরে চাইত না, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে বেশ কথাবার্ত্তা কইত। এর ফলে অফিসাররা রোজ সন্ধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে ফরাসীদের সঙ্গে আগুণের ধারে বসে গল্পস্বল্প করত।

আস্তে আস্তে সহরের চেহারা আগেকার মত হতে লাগল। ফরাসীরা কদাচিৎ রাস্তায় বেরুত, জার্ম্মাণ-সৈন্যেরাই সর্ব্বত্র হৈ হৈ করে বেড়াত। বাকীর মধ্যে ছিল ব্লু-হুসার দলের অফিসাররা; তারা লম্বা লম্বা তরবারি ঝুলিয়ে সদম্ভে রাস্তায় চলত, কিন্তু আগের বছরের পা দল সৈন্যের অফিসারদের চেয়ে ওরা বেশী ঘৃণা, সহরের সাধারণ লোকদের দেখাত না।

কিন্তু চারদিকের বাতাসের ভিতর নূতন তীব্র কি যেন একটা ঢুকে ছিল,—অনভ্যস্ত, বিশ্রী একটা চাপা চাপা ভাব লোকের দম আটকে দিচ্ছিল, হাওয়ার মুখে চারিয়ে-যাওয়া একটা গন্ধের মত,—যার কারণ হচ্ছে জর্ম্মাণদের সহর অধিকার। পথ ঘাট, ঘরদোর সর্ব্বত্র ঐ ভাবে আক্রান্ত; খাবার জিনিস পর্য্যন্ত ঐ কারণে স্বাদহীন। মনে হয় যেন কোন একটা সুদূর দেশে, যেখানে অসভ্য, নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর

প্রকৃতির লোকের বাস, সেইখানে সবাই মিলে জাহাজের খোলে বন্ধ হয়ে যাত্রা করছে।

বিজেতারা প্রচুর টাকার দাবী করত এবং প্রচুর টাকাই পেত। সহরের বাসিন্দারা যখন যে টাকা চাওয়া হত তাই দিত, কারণ টাকার অভাব তাদের ছিল না।

এদিকে সহরের পাঁচশত মাইল ভাটিতে "ক্রোয়াসে,' "ডীপে ডাল" বা "বীসার্টের নীচে নদীতে, জেলে ও মাঝিরা প্রায়ই মরা জার্ম্মান দেহ দু একটা করে পেত। পরণে তাদের য়ুনিফর্ম, আর সাধারণত দা বা লাঠির আঘাতে, পাথর দিয়ে মাথাটা ছেঁচে বা পুলের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে, তাদের খুন করা হয়েছে। মানুষে এমনি করে' লুকিয়ে থেকে প্রতিহিংসা বৃত্তির তৃপ্তি সাধন করত, যা বর্ব্বরোচিত হলেও নিতান্ত স্বাভাবিক। এই বীরত্বের জন্য তারা পুরস্কার পেত না; নিঃশব্দে, গোপনে এই যুদ্ধ জয় হত,—কিন্তু যশের অংশ এতে না থাকলেও বিপদের সম্ভাবনা কিছুমাত্র কম ছিল না। এই ধরণের যুদ্ধে, পরাজিত পক্ষের সমাধি হত নদীর বিস্তৃত গর্ভে।

একটি মাত্র আদর্শ বা আইডিয়ার জন্য মরতে প্রস্তুত, এমন তর বাছা বাছা সাহসী পুরুষ, চিরকালই বিদেশী-বিদ্বেষে এমনি করে জ্বলে ওঠে।

এরপর ক্রমে যতই দেখা যেতে লাগল যে, বিজেতারা জয়পথে, আগাগোড়া যে সব ভয়ঙ্কর অত্যাচার করতে করতে আসছিল, সহর শাসন করতে গিয়ে তার কোনটাই আর সেখানে করল না, ততই লোকের মন নিঃশঙ্ক হতে লাগল। ব্যবসা বাণিজ্যের

আশা ফের সব ব্যবসায়ীদের মনে জেগে উঠল। "হাভরে" "অনেকের প্রচুর টাকার মালামাল ছিল। তাই মহাজনেরা মনস্থ করলে স্থলপথে ডীয়েপ গিয়ে, তারপর জাহাজে চড়ে "হাভরে" যাবে।

যে সব জার্ম্মাণ অফিসারের সাথে তাদের পরিচয় ছিল, তাদের হাত করে জেনারেলের কাছ থেকে ছাড় পত্র নেওয়া হল।

চার ঘোড়ার একখানা বড় গাড়ী ভাড়া করা হল এবং ঠিক হল তাতে দশজন যাবে। শেষটা লোকজন না জমে যায় এজন্য যাত্রার সময় নির্দ্দিষ্ট হল মঙ্গলবার সকালে, ফর্সা হবার আগেই।

কদিন ধরে একটু একটু করে বরফ পড়ে মাটি ঢাকা পড়তে সুরু হয়েছিল। সোমবার প্রায় তিনটে থেকে কালো মেঘ বরফ বৃষ্টি আরম্ভ করে দিল। সারা সন্ধ্যা, সারা রাত্রি অবিরাম বরফ পড়ল

ভোর সাড়ে চারটায় যাত্রীরা গাড়ী চড়বার জন্য হোটেল-দ্য-নরমাণ্ডির উঠানে এসে জুটল।

তখনও কারো ঘুমন্ত ভাব কাটেনি, জামা কাপড় গায়ে, সকলে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না,—ছালার মত একরাশ মোটা কাপড়ে ঢাকা, তাদের দেখাচ্ছিল ঠিক ক্যাসক পরা পেট-মোটা পাদরীদের মত। খানিক পরে দু'জন পরস্পরকে চিনতে পারল, তৃতীয় আরেকজন তাদের কাছে এগিয়ে এল। তখন কথাবার্ত্তা আরম্ভ হল।—"আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আছেন", একজন বললে—"আমারও তাই"। "আমার সঙ্গেও আমার পরিবার", প্রথম লোকটি বললে, "আমরা আর রুঁয়াতে

ফিরছি না। প্রুসীয়ানারা যদি "হাভ্রের" দিকে এগোয় তবে সোজা ইংলণ্ড মুখে রওনা হব"। সকলেই জাত ভাই, সকলেরই সেইমত।

ঘোড়া তখন পর্য্যন্ত গাড়ীতে যোতা হয়নি। আস্তাবলের একজন সইস একটা ছোট লণ্ঠন হাতে করে—এক একবার এ দরজা দিয়ে বেরিয়ে আরেক দরজা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো খড় বিছানো রাস্তায় কেবলই পা ঠুঁকছিল। ঘরের মাঝে অনেক দূর থেকে কার গলা শোনা যাচ্ছিল, সে ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে কথা বলছে ও বকাবকি করছে। টুং টাং শব্দে বোঝা গেল সাজ কসা হচ্ছে। শব্দ ক্রমেই পরিষ্কার হতে লাগল; সে শব্দ ঘোড়ার শরীরের দুলুনীর সাথে তালে তালে বাড়তে থাকে, হঠাৎ থেমে যায়, তারপরেই মাটীতে ঘোড়ার নাল-ঠোকা-পা ছোড়ায়, তা আবার জোরে সুরু হয়।

দরজাটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। সব চুপ। যাত্রীরা ঠাণ্ডায় জমে যাবার মত, ক্রমে সবার বিরক্তি ধরে গেল, সবাই খুঁটির মত খাড়া দাঁড়িয়ে, হিমে আড়ষ্ট।

অবিরাম সাদা তুষার কণা পড়েছে, যেন একটা পরদা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন জিনিষের চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, আগাগোড়া বরফে ঢাকা, যেন মাটির গায়ে সাদা শ্যাওলা পড়েছে। শীতের রাত্রের শান্ত ও নিদ্রামগ্ন সহরের, এই বিরাট নিস্তব্ধতায় আর কিছুই কানে আসছিল না—শুধু অবিরাম বরফ পড়ার ঐ অস্ফুট অবর্ণনীয়, দূরাগত মৃদু শব্দও নয়, শুধু শব্দের একটা নিবিড় অনুভূতি, জগৎ-জোড়া যে প্রাণের স্পন্দন চলেছে তারই আভাস।

সইসটা খানিক লণ্ঠন হাতে করে লাগাম ধরে এগোতে এগোতে নিতান্ত এক পক্ষীরাজ ঘোড়াকে টানতে টানতে ফিরে এল। তাকে যোয়ালের ভিতর পুরে যোত কসে দিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে ফিরে চারদিক দেখতে লাগল ঠিক হচ্ছে কিনা, কারণ লণ্ঠনে এক হাত আটকা থাকাতে শুধু একহাতে তাকে কাজ করতে হচ্ছিল। দ্বিতীয় ঘোড়া আনবার জন্য ফিরতেই তার চোখ পড়ল থামের মত দাঁড়িয়ে বরফে-সাদা সব যাত্রীদের উপর। তাদের অবস্থা দেখে সে বললে, "আপনারা, গাড়ীতে চড়ে বসুন না কেন, মাথাটা বাঁচবেত" ?

এই সোজা কথাটা তারা ভাবেনি। এখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। প্রথম তিনজন তাদের স্ত্রীদের আগে উঠিয়ে নিজেরা উঠে বসল। বাকী যারা আপাদ মস্তকে কাপড় মুড়ি দিয়ে "ভূতের" মত দাঁড়িয়ে ছিল তারাও বিনাবাক্যব্যয়ে, এক একটা জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

নীচে পা রাখবার জায়গায় খড় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহিলারা পা গরম করবার জন্য তামার "সোকারেট" এনেছিলেন, এখন সে গুলো জ্বালিয়ে দিলেন। মোটা গলায় কে যেন এতক্ষণ ধরে ঐ গুলোর বিজ্ঞাপন জাহির করেছিলেন, যা হয়ত হাজার বার লোকে শুনেছে।

পথ অনেক ও ভার বেশী বলে, দুই ঘোড়ার জায়গায় চার ঘোড়া যোতা হল। তারপর বাইর থেকে একজন ডেকে বললে,—"সবাই গাড়ীতে উঠেছেন আপনারা" ? ভিতর থেকে একজন উত্তর দিলে "হাঁ", গাড়ী তখন ছেড়ে দিল।

অতি ধীরে ঠুক ঠুক করে গাড়ী চলতে লাগল। রাস্তা বরফে ঢেকে গিয়েছিল; গাড়ীখানা শ্রুতিকটু কোঁচ কোঁচ শব্দ করতে করতে চলল। ঘোড়াগুলো হাঁপিয়ে, ফোঁপাতে ফোঁপাতে এগোতে লাগল। কোচোয়ানের লম্বা চাবুক অবিরাম চট্‌পট্‌ শব্দ করে চারদিক ঘুরতে লাগল, সপাং সপাং করে সরু সাপের মত উঠ্‌তে পড়তে লাগল, কখন পটাং করে নীচে নেমে, ঘোড়ার পিছনটা যেই উঁচু হয়ে ওঠে, অমনি তার উপর পড়তে থাকল।

আস্তে আস্তে চারদিক পরিষ্কার হতে লাগল। খাঁটি রুঁয়া-বাসী যাত্রীরা যাকে তুলোর বৃষ্টির সাথে তুলনা করেছিল, সেই সাদা তুষারপাত অনেক আগেই থেমে গিয়েছিল। চাপবাঁধা কালো মেঘ চুইয়ে একরকম ঘোলাটে আলো বেরিয়ে চারিদিকের সাদা চেহারাকে আরও সাদা করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে আগাগোড়া তুষরাচ্ছন্ন বড় বড় গাছ ও বরফের ঘোমটা পরা দু'একটা কাঁচা বাড়ী দেখা যেতে লাগল।

গাড়ীর ভিতরে এই অস্পষ্ট আলোতে যাত্রীরা সকৌতূহল পরস্পরের দিকে চাইল।

গাড়ীর সব চেয়ে ভাল জায়গায় পরস্পরের মুখোমুখি চেয়ে ম্যঁসে ও মাডাম লোয়াসেও ঘুমচ্ছিলেন। তাঁরা "গ্রাঁদ-পঁৎ" রাস্তার পাইকারী মদের ব্যবসায়ী।

লোয়াসেও প্রথমে ছিল এক মদের ব্যবসায়ীর মহুরী; ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে সে লোকটা দেউলে হলে, লোয়াসেও সেটা কিনে নিয়ে তার যথেষ্ট উন্নতি করে। মফস্বলের খুচরা দোকানীদের কাছে খুব বেশী দরে, খুব খারাপ মাল বিক্রী করে তার বিস্তর পয়সা

হয়েছিল। আলাপী ও বন্ধু বান্ধবের কাছে, খুব ধড়িবাজ লোক, ফিকির ও স্ফূর্ত্তিবাজ খাঁটি নর্ম্মাণ, বলে তার খ্যাতি ছিল।

তার এই জুয়াচুরির নাম কত বিস্তৃত ছিল নিম্নলিখিত ঘটনা থেকে তা বোঝা যাবে। প্রিফেক্টের বাড়ী এক সান্ধ্যসম্মিলনীতে বহু গান ও গল্পের রচয়িতা, উচ্চদরের হাস্যরসিক, স্থানীয় নামজাদা লেখক ম্যাঁসে টুরনেল উপস্থিত ছিলেন। তিনি কয়েকটি মহিলার ঝিমুনির লক্ষণ দেখে তাঁদের কাছে প্রস্তাব করলেন যে, এক বাজি "গোলামচোর" নয়, "লোয়াসেও চোর" খেলা যাক। এই রসিকতা তখনই প্রিফেক্টের সালোনে ও তারপর সহরের মধ্যে প্রচার হয়ে সকলকে একমাস ধরে হাসিয়েছিল।

সব রকম হাসি মসকরা ও বদ্ ও সৎ দু'রকমের ঠাট্টাতেই লোয়াসেও সমান দক্ষ ছিল। তার কথা উঠলে প্রত্যেক "ও লোকটির জুড়ী নেই" এ কথাটি না বলে থাকতে পারত না।

খাটো শরীর ও বিশাল পেটধারী, তাকে দেখতে মনে হত যে একটা বেলুনের উপর কাঁচা পাকা দুই গোচ্ছা গোঁফের মধ্যে যেন ছোট একটা লালচে মুখ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার গৃহিণী ঠিক উল্টো—লম্বা চওড়া, শক্ত সামর্থ, রাশভারি মেয়ে মানুষ। তার গলা মর্দ্দানী আর কার্য্য-তৎপরতা জাঁদরেলি। দোকানের খাজাঞ্চি ও মেনেজার সবই তিনি। লোয়াসেও-এর কাজ ছিল সুধু চারদিক সর-গরম করে রাখা।

এদের পাশে বসেছিলেন কিছু উচ্চদরের ও উচ্চতর শ্রেণীর লোক। ম্যাঁসে কারে-লামাডোঁ পদস্থ লোক, তিনটি সুতার মিলের স্বত্বাধিকারী, লেজিয়ঁ দ্য-অনেরের এর অফিসার ও সাধারণ কাউন্সিল

সভার সদস্য। নেপোলিয়নের শাসনকালে তিনি বরাবর শাসন প্রণালীর সমালোচক দলের নেতা ছিলেন এবং এজন্য ভাল রকমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন;—এর কারণ, তিনি নিজ মুখেই বলতেন, তিনি নাকি ভদ্র-অস্ত্র, অর্থাৎ শুধু মুখের কথা দ্বারা যুদ্ধ করতেন। মাডাম কারে-লামাডোঁ স্বামীর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। রুঁয়াতে সৈন্যদলের মধ্যে যে সব ভদ্রবংশীয় অফিসার আসত, তারা কেবল তাঁর সঙ্গেই মিশত।

মাডাম কারে-লামাডোঁ দেখতে ছোটখাট, খুব সুশ্রী ও সুন্দরী। তিনি স্বামীর মুখোমুখি বসে, আপাদ-মস্তক গরম পোষাকে জড়িত হয়ে গাড়ীর ভিতরের অবস্থাটা দেখছিলেন; চোখে অত্যন্ত করুণ ভাব।

তাঁদের পাশে বসেছিলেন ব্রেভিলের কাউন্ট ও কাউন্টেস হুবার্ট। তাঁরা নর্ম্মানডির অতি পুরাতন ও উচ্চ অভিজাত বংশের প্রতিনিধি। কাউন্টের লম্বা চওড়া চেহারার সঙ্গে রাজা চতুর্থ হেনরীর চেহারার কিছু সাদৃশ্য ছিল। তিনি ঘষে মেজে, নানা উপায়ে এই সাদৃশ্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তাঁর পরিবারে এ একটা গৌরবের কাহিনী বলে জানা ছিল যে, ঐ রাজার সঙ্গে আলাপের ফলে ব্রেভিল বংশের এক মহিলার গর্ভে এক ছেলে হয় এবং ঐ মহিলার স্বামী এই কারণে কাউন্ট উপাধি ও প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ পান।

কাউন্ট হুবার্ট সাধারণ কাউন্সিল সভার সদস্য ও তাঁর প্রদেশের অরলিয়ানিষ্ট দলের নেতা ছিলেন। "নানটের" অতি সামান্য এক জাহাজওয়ালার মেয়ের সাথে কি করে যে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, কেউ তার কোন কারণ খুঁজে পেত না। কিন্তু কাউন্টেসের রূপ ছিল এবং

অতিথি অভ্যাগত সৎকার তিনি সবার চেয়ে ভাল করতেন। এই কারণে সকলেই কথাটা বিশ্বাস করে নিত যে, রাজা লুই ফিলিপের এক ছেলে তাঁর প্রেমে পড়েছিল। সমস্ত অভিজাত সম্প্রদায় তাঁকে বিস্তর খাতির করতেন এবং তাঁর সালোন, সকলের উপরে স্থান পেত। কেবল তাঁর সালোনেই মেয়ে পুরুষের মেশবার প্রাচীন প্রথা ও আদব-কায়দার চলন ছিল,—আর ঠিক আগেকার মতই যে সে সেখানে ঢুকতে পারত না।

ব্রেভিল-পরিবার বড়লোক ছিলেন ভূ-সম্পত্তিতে; তাঁদের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় পাঁচ লক্ষ লিভ্র।

এই ছয়জন গাড়ীর সব চেয়ে ভাল জায়গাটি দখল করে বসেছিলেন। সমাজের সেই শ্রেণীতে এঁরা বাস করতেন যে শ্রেণীর হাতে থাকে পয়সা ও ক্ষমতা এবং মনে নিরুদ্বেগ ভাব। সমাজের ভূষণ-স্বরূপ সব গুণই এঁদের ছিল; যথা—ধর্ম্মজ্ঞান ও সব বিষয়েই একটা করে, বড় মত।

ঘটনাক্রমে মহিলারা সকলেই বেঞ্চে বসেছিলেন। কাউণ্টেসের পাশে ছিলেন—দুটি nun তাঁদের গলায় ঝোলানো ছিল লম্বা জপমালা আর ঠোঁট নেড়ে নেড়ে তাঁরা ভগবানের নাম করেছিলেন। একজন বয়সে বৃদ্ধা ও তাঁর সমস্ত মুখটা বসন্তের দাগে এমনি ভরা যে মনে হয় কেউ যেন তাঁর নাকের গোড়ায় ছররা-ভরা বন্দুক ছেড়ে দিয়েছে। অপরটি নেহাৎ রোগা। মুখের চেহারা সুন্দর বটে কিন্তু বেজায় শুকনো। চেহারা দেখেই বোঝা যায় যে অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ধার্ম্মিকতার ফলে মানুষের যেমন হয়ে থাকে তেমনি সাংঘাতিক ক্ষয় রোগে তাঁকেও ধরেছে।

এই দুইজন ধর্ম্মশীলা মহিলার পাশে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক বসেছিল,—যাদের উপর সকলেরই চোখ পড়ছিল।

পুরুষটিকে সকলেই জানত, তার নাম "করনুদেৎ"। পলিটিক্সে সে ছিল ডেমোক্রাট; সহরের তাবৎ ভালমানুষ ভদ্রলোক তার কাছ দিয়ে ঘেঁষতেন না। কুড়ি বছর বয়েস থেকে রাজ্যের ছোট বড় সব ডেমোক্রাটিস কাফের মদের গেলাসে, সে তার লম্বা রাশিয়ান দাড়িশুদ্ধ মুখ ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার বাপ ছিল মেঠাইওয়ালা এবং মরবার সময় ছেলেদের জন্য যথেষ্ট টাকা পয়সা রেখে যায়। কিন্তু ভাইদের ও ইয়ারদের সহযোগে করনুদেৎ অবিলম্বে পৈতৃক সম্পত্তি সাবাড় করে। এখন বসে বসে কবে যে রিপাব্লিক হবে তারই দিন সে গুণছিল,—কারণ, তারা আশা ছিল যে এতদিন ধরে এত ডিমোক্রাটিক মদ সে উদরস্থ করেছে, দেশে রিপাবলিক হলে, তা বিফলে যাবে না—ভাল রকম একটা চাকরী বাকরী তার নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। সেপ্টেম্বরে তার ধারণা হয়েছিল যে তাকে প্রিফেক্ট করা হয়েছে। কিন্তু কাজের ভার নেবার জন্য আফিসে ঢুকলে সেখানকার ছোকরারা তাকে মোটেই আমল দিতে চাইল না, বাধ্য হয়ে তাকে পশ্চাদপদ হতে হল। কিন্তু আর আর বিষয়ে সে খুব ভাল মানুষ, কাজের লোক, ও মোটেই ঝগড়াটে নয়। যুদ্ধ বাধলে সে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে সহর রক্ষার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল। সমান জায়গায় খাল কেটে কেটে, আশ পাশের জঙ্গলের ছোট গাছপালা কেটে কুটে, সব রাস্তাগুলোতে মানুষ-মারা কল বসিয়ে বসিয়ে সে কাজ চালাতে লাগল। শত্রুরা কাছে আসতেই এই সব চমৎকার ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে নিশ্চিন্ত ও খুসী মনে সে একদম সহরের ভিতর

পিটটান দিলে। হাভ্‌রে যাবার তার মতলব ছিল এই যে, সেখানে নূতন কিছু কিছু দেশরক্ষার ব্যবস্থার দরকার, সেখানে সে নিজের সামরিক অভিজ্ঞতা ও শক্তি আরও ভাল করে কাজে লাগাতে পারবে।

স্ত্রীলোকটি হচ্ছে সেই শ্রেণীর যাকে সাধুভাষায় আমরা রূপের ব্যবসায়ী বলি। অল্প বয়সেই তার রূপের এমন খোলতাই হয়েছিল, যে লোকে তাকে "বুল-দ্য সুইফ" বা চর্ব্বির গোলা বলে ডাকত। দেখতে ছোট খাটো, গোল গাল, নাদুস নুদুস,—হাতের আঙ্গুল মোটা মোটা, গায়ে গায়ে লাগা। গায়ের উপর চামড়া নরম ও চক্‌চকে। গলাটি লম্বা, ভাঁজ খাওয়া। চেহারা খানিতে এমন একটা তাজা যৌবনের প্রকাশ ছিল, যা দেখে আনন্দ হয়। লোকের চোখ বাধ্য হয়ে তার দিকে ফিরত। আগাগোড়া তাকে দেখলে মনে হয় সে যেন একটা লাল টুক্ টুকে আপেল, একটি স্ফুটোনোন্মুখ পিওনি ফুলের কুঁড়ি। ভাসা ভাসা দু'টি কালো চোখ; তার উপরে বিশাল, নিবিড় চোখের পাতা চোখের ভিতরে যার ছায়া পড়েছে। তার নীচেই সুন্দর, ছোট মিষ্ট মুখখানি, রাঙা ঠোঁট দুটির ভিতর দিয়ে অতি ক্ষুদ্র, চক্‌চকে দাঁতের সার দেখা যাচ্ছিল।

লোকে বলত শুধু রূপ নয়, অনেক অনন্যসাধারণ গুণও তার ছিল।

যে মুহূর্ত্তে তাকে সবাই চিনতে পারলেন সেই মুহূর্ত্তে গাড়ীর বাঁকী সব ভদ্রমহিলা মণ্ডলীর মধ্যে ফুস্ ফাস্, কানাকানির ধুম পড়ে গেল। "বেশ্যা", "বাজারের স্ত্রীলোক" ইত্যাদি কথা এত উচু গলায় কানাকানি হতে লাগল যে, সে মাথা তুললে তারপর এমনতর কটমট নির্ভয়

চাহনীতে তাঁদের দিকে চাইল যে সবাই একদম চুপ হয়ে গেলেন। সকলেই চোখ নামিয়ে ফেললেন, শুধু লোয়াসেও অত্যন্ত ফুর্ত্তির সঙ্গে তাকে দেখতে লাগল।

গাড়ীতে এই মেয়েটি উপস্থিত থাকার দরুণ বিবাহিতা তিনজনা মহিলা নিজেদের ভিতর ফের কথাবার্ত্তা সুরু করলেন। আপনাদের বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা ও ভব্যতার অনুরোধে এই নির্লজ্জা বাজারের বেশ্যাটার বিরুদ্ধে সকলের একজোট হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বলে তাঁদের মনে হল। কারণ, আইন মোতাবেক কাজ যাঁরা ভালবাসেন, যারা বে-আইনী কাজ ভালবাসে তাদের কখন দুচক্ষে দেখতে পারেন না।

ভদ্রলোক তিনটির মনেও পরস্পরের মধ্যে হঠাৎ একটা আত্মীয়তার ভাব বোধ করলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ তাচ্ছিল্যের সাথে স্বীয় দারিদ্র্যের কথা বলতে লাগলেন। কাউণ্ট হুর্বাট প্রুসীয়ানদের আক্রমণের দরুণ, গরুমহিষ চুরি ও শস্যাদি নষ্ট হওয়ায় তাঁর কি রকম ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে, এবং তাঁর মত কোটিপতির পক্ষে সেটা বিশেষ কিছু না হলেও ব্যাপারটা কিরূপ ভয়ানক তাই সবিস্তারে বললেন। তুলার ব্যবসায়ে বিশেষজ্ঞ ম্যাঁসে কারে,—পাছে নষ্ট হয় এই ভয়ে তিনি দুইকোটী ফ্রাঙ্ক ইংলণ্ডে পাঠিয়েছেন। আর লোয়াসেও বললেন যে তার দোকানের সমস্ত চলতি মদ সে কমিশারিয়েট বিভাগের কাছে বেচে দিয়েছে—তাতে তার কাছে গভর্ণমেণ্টের অনেক দেনা হয়েছে। হাভরে টাকাটা পাবার আশা আছে।

তাঁরা সকলেই পরস্পরের দিকে মহা খাতির ও প্রীতির ভাব দেখিয়ে চাওয়া চাওয়ি—করতে লাগলেন। একদরের বা একশ্রেণীর

লোক না হলেও সকলেই রেস্তওয়ালা বটেন। ট্যাঁক তাঁদের কারও খালি নয়,—নাড়াচাড়া দিলে সকলের পকেট থেকেই ঝুন ঝুন শব্দ বেরবে— এই হিসেবে তাঁদের এক সম্প্রদায়ের লোক বলা চলে,— এবং সে সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতা হচ্ছে রূপচাঁদ।

গাড়ী এত আস্তে আস্তে চলছিল যে বেলা দশটার সময় বার মাইল পথমাত্র এগোল। গাড়ীর পুরুষ যাত্রীরা বার বার ওঠা নামা করতে লাগলেন। সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কারণ, টোটে-তে ব্রেকফাষ্ট। সন্ধ্যার আগে সেখানে যাওয়াই যাবে না। এক একবার গাড়ীর চাকা বরফের স্তূপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল, আর তাকে টেনে বার করতে লাগছিল দু'ঘণ্টা। সেই অবসরে সকলেই এদিক ওদিক দেখছিলেন যদি এক আধটা সরাই চোখে পড়ে।

এদিকে ক্ষিদের চোটে সকলের মাথা ঘুরে উঠল। এতটা পথের কোথাও একটা দোকান পাট হোটেল কিছুই নেই, প্রুসীয়ানদের আবির্ভাবে ও বুভুক্ষু ফরাসী সৈন্যের যাতায়াতে সবরকম বেচা কেনা উঠে গেছে।

বেচারা ভদ্রলোক কটি যা হোক কিছু খাবারের জন্য পথের পাশের চাষাদের বাড়ী পর্য্যন্ত ধাওয়া করতে সুরু করলেন,—একটা রুটি পর্য্যন্ত মিল্‌ল না। চাষারা দিন কাল বিবেচনা করে আগাগোড়া সব খাদ্যবস্তু লুকিয়ে রাখত, কারণ, সৈন্যগুলো ক্ষিদেয় পাগল হয়ে যা দেখতে পেত তাই ছিনিয়ে নিত।

এমনি চলতে চলতে বেলা যখন একটা বাজে লোয়াসেও আর থাকতে না পেরে বলে উঠল যে ক্ষিদেয় তার পেটে টাঁশ ধরেছে। প্রত্যেকেরই সেই অবস্থা। কথাবার্ত্তা অনেকক্ষণ আগেই থেমে

গিয়েছিল। থেকে থেকে এক একজন হাই তুলতে লাগল আর অমনি গাড়ীর সব মূর্ত্তিই একছের হাই তুলে চলল। যার যেমন স্বভাব, আদব কায়দা ও সামাজিক পদ, প্রত্যেকে সেই অনুযায়ী হাই তুলতে লাগল—কেউ সশব্দে দুই চোয়াল আলগা করে, কেউ বা মোলায়েম ভাবে, নীরবে মুখ ফাঁক করে, ও হাতের আড়াল দিয়ে।—সকলেরই হা-করা মুখ হতে ধোঁয়া বেরচ্ছিল।

বুল-দ্য-সুইফ মাঝে মাঝে কাৎ হয়ে নীচের দিকে চাইছিল, যেন কোন জিনিষ খুঁজছে। খানিক ইতস্ততঃ করে, চারদিক দেখে, আবার সোজা হয়ে বসল। যাত্রীরা সবাই ফ্যাকাসে হয়ে, শুকিয়ে উঠেছিল। লোয়াসেও বলে উঠল যে এক টুকরো মাংসের জন্য তিনি হাজার ফ্রাঙ্ক দিতে প্রস্তুত আছেন, মাদাম লোয়াসেও এই প্রস্তাব প্রতিবাদ করবার ভঙ্গী করে, থেমে গেলেন। টাকা নষ্ট করবার কথা শুনলেই তিনি কষ্ট পেতেন।—ও সম্বন্ধে ঠাট্টা তামাসাও তাঁর মাথায় ঢুকত না। কাউণ্ট বললেন—"আমারও খুব সোয়াস্তি বোধ হচ্ছে না। কিছু খাবার আনবার কথাটা যে কি করে ভুল হল বুঝতে পারছিনে।" প্রত্যেকেরই ঐ অনুশোচনা।

করনুদেৎ-এর কাছে এক ভাঁড় রম ছিল। সে সবাইকে দিতে চাইলে সকলেই গম্ভীর ভাবে প্রত্যাখান করলেন। কেবল লোয়াসেও তাতে বার দুই চুমুক দিয়ে, ধন্যবাদের সাথে পাত্রটা ফিরে দিয়ে বললেন, "এও মন্দের ভাল। হাত পাটা গরম হবে, ক্ষিদেও বসে যাবে।" ঐ মদ টুকু খেয়ে তাঁর দিল খোলাসা হয়ে উঠল। প্রচলিত ছড়ায় সমুদ্রের মধ্যে সেই জাহাজের যে গল্পটা আছে, তারই ভাবটা নিয়ে সে প্রস্তাব করে বসলে,—যাত্রীদের ভিতর যাদের গায়ে মাংস বেশী

আছে তাদের ভক্ষণ করা হোক্। বুল-ভ্য-সুইফ সম্বন্ধে এই ইঙ্গিতে গাড়ীর সভ্য ভব্য যাত্রীরা চটে উঠলেন। কেউ কোন উত্তর দিলেন না, শুধু করমুদেৎ একটু মুচকে হাসলে। nun দুটির ঠোঁট নেড়ে জপ করা অনেকক্ষণ হল থেমে গিয়েছিল। ঢিলে হাতার মধ্যে হাত গুটিয়ে ফেলে, নড়ন-চড়ন বিহীন আড়ষ্ট ভাবে, জোর করে চোখ নীচু করে তাঁরা বসেছিলেন,—বোধ করি মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন যে এই কষ্ট ভোগ করবার মহাসুযোগ তাঁদের কপালে লাভ হয়েছে।

বেলা যখন তিনটে, তখন গাড়ী সীমা সহরদ্দহীন, বিস্তীর্ণ এক মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়ল,—তার কোনদিকে একখানা গাঁয়ের চিহ্ন মাত্র নেই। বুল-ভ্য-সুইফ চট্ করে উঁচু হয়ে, বেঞ্চের নীচে থেকে সাদা তোয়ালে ঢাকা একটা ঝুড়ি বের করে ফেললে।

ঐ বাসকেটের ভিতর থেকে প্রথমে বেরুল একটা প্লেট, তারপর একটা গিল্টি করা পেয়ালা ও শেষে একটা বড় ডিস। ডিসের উপর ছিল, দুটো ফাউল, কাটা ও মসলা-মাখা। এ ছাড়া ঝুড়ির ভিতর আরও প্রচুর খাবার জিনিষ ছিল—যথা কেক্, ফল, মেঠাই, ইত্যাদি। পথে হোটেলে না খেতে হয় এই উদ্দেশ্যে সে তিনদিনের খাবার সংগ্রহ করে এনেছিল। ঐ সঙ্গে চারটে বোতলের গলাও দেখা যাচ্ছিল। বুল-ভ্য-সুইফ ছোট একখানা রুটি নিয়ে ফাউলের খানিকটে কেটে খেতে সুরু করে দিল।

সবগুলো চোখ তখন তার উপর গিয়ে পড়ল। একটু একটু করে মাংসের গন্ধ নাকে ঢুকতেই সকলের জিবের ডগায় জল এসে গেল। মহিলাদের মনে ঐ মেয়েটার উপর দুর্জ্জয় ঘৃণা জন্মে

গেল।—ঐ আপদটাকে যদি মেরে ফেলা যায়,এই রকম ইচ্ছেটা তাঁদের হল,—গাড়ী থেকে তুলে একেবারে ঘোড়াগুলোর পায়ের নীচে, বরফের মধ্যে, ওর পেয়ালার ঝুড়ি, খাবার দাবার সব শুদ্ধ ওকে ফেলে দিলে গায়ের জ্বালা যদি মেটে।

লোয়াসেওর চোখ দু'টো যেন ডিসের উপরকার ফাউল গিলছিল। সে বুল-ভ্য-সুইফকে উদ্দেশ করে বললে, "সুখের বিষয় আপনি খাবারের কথাটা ভেবেছিলেন, আমরা ত একটুও ভাবিনি। অল্প লোকেরই আপনার মত জ্ঞান থাকে কখন কোনটা দরকার হবে," বুল-ভ্য-সুইফ মাথাটা তুলে তাকে বললে, "আপনি খাবেন? সকাল থেকে এ পর্য্যন্ত কিছু না খেয়ে থাকা বড় কষ্টকর।" সে ধন্যবাদ দিয়ে বললে, "সত্যি বলতে কি আমার আপত্তি করবার কিছু নেই। এক পেট ক্ষিদে নিয়ে বসে থাকা আমার আর পোষাচ্ছে না। যখন যেমন, তখন তেমন,—আপনি কি বলেন? তারপর চকিতে একবার চারদিকটা চেয়ে নিয়ে বললে, "এই রকম সময়ে কেউ অনুগ্রহ করলে খুসী হওয়া উচিৎ।" তার কাছে একখান খবরের কাগজ ছিল, পোষাকে যাতে না লাগে, তাই সেই কাগজখানা হাঁটুর উপর বিছিয়ে নিয়ে, পকেট থেকে একখানা ছুরি বের করে, ফাউলের একটা ঠ্যাং তুলে, খানিকটে কেটে নিয়ে মুখে পুরে চিবোনো সুরু করলেন—তার স্ফূর্ত্তি দেখে গাড়ীর বাকী সকলে সখেদ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কিন্তু বুল-ভ্য-সুইফ অতি বিনীত ও মধুর স্বরে Nun-যুগলকে খেতে অনুরোধ করলে। তাঁরা দু'জনেই তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে চোখ নীচের দিকে রেখেই, অস্পষ্টস্বরে কি ধন্যবাদ দিয়ে, অত্যন্ত দ্রুত বেগে হাত

ও মুখ চালাতে লাগলেন। করমুদ্যেৎও ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলে না। সে ও Nun দুটির হাঁটুর উপর খবরের কাগজ পেতে টেবিলের মত করে নিলে।

তারপর কেবল মুখ খোলা ও বন্ধ হওয়া, গেলা, চিবানো ও গেলা—ভীষণ বেগে এই ব্যাপার চলতে লাগল। লোয়াসেও তার কোণে বসে ক্ষিপ্রগতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল তার স্ত্রীকেও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বললে। তিনি অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে পেটের ভিতরটায় একবার টান ধরতেই রাজি হয়ে গেলেন। তখন লোয়াসেও ভাষা চোস্ত করে, বুল-দ্য-সুইফকে Charming Companion বলে আপ্যায়িত করে জিজ্ঞাসা করলে তার স্ত্রীকে এক আধটু সে দিতে পারে কিনা। বুল-দ্য-সুইফ বললে, "নিশ্চয়"। তারপর একটু মধুর হেসে ডিসটা তুলে ধরলে।

মদের প্রথম বোতলটা খোলা হলে একটু মুস্কিল বেধে গেল, পাত্র ছিল কেবল একটা। সেইটেই মুছে নিয়ে সকলে হাত বদল করলেন; কেবল করমুদ্যেৎ সৌজন্য দেখাবার মতলবেই যে জায়গাটাতে বুল-দ্য-সুইফ চুমুক দিয়েছিল ঠিক সেইখানেই ঠোঁট লাগিয়ে চুমুক দিল।

যখন চারদিকের মানুষগুলো সবাই খাচ্ছে আর নাকে খাবারের এই গন্ধ ভুর ভুর করে ঢুকছে—তখন কাউণ্ট ও কাউণ্টেস ব্রেভিল ও ম্যাঁসে ও মাদাম কারে-লামাডোঁর যে অবস্থাটা হল তাকে টাণ্টালাসের শাস্তির সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে। হঠাৎ মাদাম কারে-লামাডো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন—সবাই সেইদিকে মুখ ফেরালেন। তাঁর চেহারা ঠিক বরফের মত শাদা হয়ে

গিয়েছে, চোখ দু'টো বন্ধ, কপালটা কাঁপছে; তিনি মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন। তাঁর স্বামী পাগলের মত হয়ে হাঁক ডাক করতে লাগলেন। সকলেই হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। সেই Nun দুটির মধ্যে বড়টি মূর্চ্ছিতার মাথাটা ধরে বুল-দ্য-সুইফের মদের গেলাস তাঁর মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে খানিকটে বরদ্যো সুরা তাঁকে খাইয়ে দিলেন। তখন মাদামের মূর্চ্ছা ভেঙ্গে গেল। তিনি চোখ খুলে মৃদু হেসে করুণ কণ্ঠে বললেন যে তিনি বেশ ভাল বোধ করেছেন। কিন্তু ফিরে আবার তিনি মূর্চ্ছিত না হন এজন্য সেই বৃদ্ধা আরও খানিকটে বরদ্যো তাঁকে খাইয়ে বললেন, "এর কারণ আর কিছু নয়, কেবল অনাহার"।

এই শুণে বুল-দ্য-সুইফ মুখ লাল করে, একটু ইতস্ততঃ করে, বাঁকী যে চারজন যাত্রী অনাহারী ছিলেন তাদের দিকে চেয়ে বলে উঠলে, "আপনাদের অনুরোধ করতে আমার সাহস হচ্ছে না, যদি অপরাধ না নেন তবে"—লোয়াসেও তার বক্তব্যের বাঁকীটুকু শেষ করলে, "বর্ত্তমান অবস্থায় সকলে ভাই ভাই—এবং পরস্পরের সাহায্য করবে। সভ্যতা ভব্যতা ছেড়ে ছুড়ে লেগে যান, কে জানে রাত কাটাবার মত একখানা কুঁড়েও আমাদের ভাগ্যে জুটবে কিনা। যে গতিতে গাড়ী চলেছে কাল দুপুরের আগে যে টোটে-তে যেতে পারব সে ভরসা নেই," তাঁরা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, "হাঁ" বলবার দায়িত্ব কেউ ঘাড়ে নিতে চান না। শেষে কাউণ্ট এ সমস্যার-মীমাংসা করে দিলেন। মোটা, ভীরু, সেই মেয়েটার দিকে চেয়ে সৌজন্য সহকারে তিনি বললেন, "আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আপনার নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করছি।" আরম্ভ করতেই কি মহা গোলযোগ! একবার জাত

গেলে ছত্রিশ জাতই সমান হয়ে যায়। অবিলম্বে খাবারের ঝুড়ি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল।

ও মেয়েটার খাবার খাব কিন্তু ওর সাথে কথা বলব না, এ করা চলে না। কাজেই কথাবার্ত্তা সুরু হল প্রথমে বাধ বাধ ভাবে, কিন্তু সেও কথা কইতে যে বেশ পটু এই প্রমাণ হতে, সে সঙ্কোচের ভাবটা কেটে গেল। কাউণ্টেস ব্রেভিল ও মাদাম কারে লোমাডোঁ ভদ্রতার রীতিনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ—তাঁরা তার সাথে অতি মোলায়েম ব্যবহার করতে লাগলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে কাউণ্টেস ব্রেভিল অতি নরম কথা বার্ত্তায় তাকে আপ্যায়িত করতে লাগলেন। উচ্চবংশীয় ও উচ্চপদস্থ মহিলাদের, লোকের অবস্থা নির্ব্বিশেষে তাদের সঙ্গে যে মার্জ্জিত সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করবার ক্ষমতা দেখা যায়, তা তাঁর পুরা মাত্রাতেই ছিল। দলের মধ্যে কেবল কাটখোট্টা স্বভাব বলে মাদাম লোয়াসেও গোঁ ধরে বসে থাকলেন। অথবা বাক্যব্যয় না করে যথা সম্ভব দ্রুতগতিতে তিনি মুখ হাত চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কথাবার্ত্তা প্রথমেই যুদ্ধের বিষয় নিয়ে আরম্ভ হল—প্রুসীয়ানদের বর্ব্বরের মত ব্যবহার সম্বন্ধে গল্প, ফরাসীদের বীরত্ব সম্বন্ধে গল্প সকলেই অবশ্য এমনি করে রাতারাতি সহর ছেড়ে পালাচ্ছিলেন, কিন্তু তাই বলে যাঁরা সহরে রয়ে গেলেন তাঁদের সাহসের যথোচিত প্রশংসা করতে তাঁরা কোন ত্রুটি করলেন না। তারপর সকলের নিজের কথা সুরু হল। বুল-দ্য-সুইফ বললে সে কেন রোঁয়া ছাড়ছে। অনেক স্ত্রীলোককে দেখা যায় যে, মনের কথা বলতে হলে, তারা উত্তেজিত না হয়ে পারে না।—বুল-দ্য-সুইফও কথা

বলতে বলতে গরম হয়ে উঠল। সে বললে, "আমি প্রথমে ঠিক করেছিলেম যে রোঁয়াতেই থেকে যাব। আমার ঘরে খাবার জিনিষ পত্র সব সঞ্চয় করা ছিল। বাড়ী ঘর ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে অজানা স্থানে বেরিয়ে পড়বার চাইতে দু'চারটে সৈন্যকে খেতে দেওয়া অনেক ভাল। কিন্তু প্রুসীয়ানগুলো যখন এসে পড়ল তখন আর মাথা ঠিক রাখতে পারলেম না। আমার শরীরের সব রক্ত রাগে গরম হয়ে উঠল—সমস্ত পথটা কেবল ধিক্কারে ও লজ্জায় চোখের জল ফেলেছি। যদি পুরুষ মানুষ হতেম,—তাহলে দেখে নিতেম! জালনা দিয়ে আমি দেখতে লাগলেম, চুড়োওয়ালা-টুপী মাথায় ঐ পেট মোটা শূয়োর গুলোকে—আমাকে জোর করে হাত ধরে না আটকালে, নিশ্চয় আমি সব চেয়ার বেঞ্চিগুলো ওদের ঘাড়ের উপর ফেলে দিতেম, তারপর কটা এল আমার বাড়ীতে থাকবার জন্য,—ঘরে ঢুকতেই প্রথমটার ঘাড়ের উপর আমি লাফিয়ে পড়লেম। ওদের গলা নিশ্চয় অন্য লোকের চাইতে শক্ত নয়। যেটাকে ধরেছিলেম সেটাকে চুকিয়ে দিতেম যদি আমায় চুল ধরে হতভাগাটা না টানত। এই ব্যাপারের পর আমার পালিয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় ছিল না। —রোঁয়া ছাড়বার এই সুবিধেটা জুটে যেতেই চলে এসেছি।"

সকলে তাকে প্রশংসা করলেন। তার সঙ্গীদের ভিতর অতটা সাহস কেউ প্রকাশ করেনি,—সেই অনুপাতে প্রত্যেকের চোখেই সে বড় হয়ে উঠল। করনুদ্যেৎ ধীর ভাবে গল্প শুনছিল, মুখে সমর্থনসূচক ও উদার, উচ্চভাবব্যঞ্জক মুরুব্বীয়ানার মৃদুহাসি—কোন ভক্তের মুখে ঈশ্বরের প্রশংসা শুনলে পাদরী মাথা নেড়ে যেমন মৃদু হাসি হাসে।—কারণ লম্বা চোগা-পরা পাদরী যেমন একচেটে

করেছে ধর্ম্মকে, লম্বা দাড়িওয়ালা ডেমোক্রাট তেমনি একচেটে করেছে স্বদেশ-প্রেমকে। অতি গম্ভীর চালে সে আপনার মত ব্যক্ত করলে; দেয়ালের গায়ে হর রোজ যে সব বিজ্ঞাপন ও ঘোষণা আটা-মেরে দেওয়া হয় তাদের ভাষা যেমন জমকালো, তেমনি গুরু গম্ভীর তার ভাষা। বক্তৃতার শেষে সে "কঠোরেন সমাপয়েৎ" করলে; হাকিমি ষ্টাইলে গালাগালি দিয়ে, তৃতীয় নেপোলিয়ান নামক সেই নচ্ছার ফ্রান্সের পরাজিত সম্রাটির উদ্দেশে।

ঐ শোনা মাত্রই বুল-দ্য-সুইফ ক্ষেপে উঠল, কারণ সে ছিল বোনাপার্টিষ্ট। মুখখানা চেরির চেয়ে বেশি লাল করে রাগে তোতলাতে তোতলাতে সে বলে চললে—"তাঁর জায়গাটিতে আপনাক দেখতে পেলে আমি খুসী হতেম—আর কেউ নয় কেবল আপনাকে, তাহলে ঠিক হত নয় কি? আপনার মত চরিত্রের যারা তারাই বিশ্বাস-ঘাতকের ব্যবহার করেছে তাঁর সাথে, আপনার মত যত ফক্কোড় লোক তাদের হাতে ফ্রান্সের শাসন ভার গেলে দেশে আর লোক রইত না!"

করনুদেৎ অবিচলিতভাবে তাচ্ছিল্য ব্যঞ্জক উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলে। দু'জনে ঝগড়া বেধে যায় দেখে বহুকষ্টে লোয়াসে তাদের মাঝে পড়ে ঝগড়া থামিয়ে দিলেন—এই মন্তব্য করে' যে, আন্তরিক ভাবে যে যা বিশ্বাস করে তাই মূল্যবান! কাউণ্টেস ও মাদাম কারে লামাডোঁর মনে মনে রিপাব্লিকান মতের লোকের উপর অকারণ রাগ ছিল—এবং সাধারণতঃ মেয়েদের যেমন থাকে, তেমনি ডেস্পটিক গভর্ণমেণ্ট ও জাঁক জমকের উপর তাঁদের একটু আন্তরিক টান ছিল—তাঁরা মনে মনে তেজী স্বভাবের স্ত্রীলোকটির

উপর খুসি হলেন—কারণ তাঁদের ও তার মত প্রায় এক রকমেরই।

খাবার ঝুড়ি শেষ হয়েছিল। দশজনে মিলে ওটাকে সাবাড় করা কিছুই নয়—সকলে মনে করলেন ঝুড়িটা আরও বড় হলে ভাল হত। কথাবার্ত্তা চলতে থাকল,—কিন্তু ভোজন ব্যাপারটি শেষ হবার পর থেকে, স্বভাবতই তার উৎসাহের কমতি দেখা গেল।

দিন শেষ হয়ে রাত্রি এসে পড়ল, আস্তে আস্তে অন্ধকার ঘন হয়ে এল, আর সেই সঙ্গে ভয়ানক ঠাণ্ডা,—বুল দ্য-সুইফ অত মোটা হয়েও হি-হি করে কাঁপতে লাগল। তখন কাউণ্টেস ব্রেভিল তাঁর "সোফারেট" তাকে ব্যবহার করতে দিলেন, সকাল থেকে অনেকক্ষণ তাতে নূতন করে কয়লা দেওয়া হয়েছিল, বুল-দ্য-সুইফ খুসী হয়ে গেল, কারণ তার পাদু'টো জমে যাবার মত হয়েছিল। মাদাম কারে-লামাডোঁ ও মাদাম লোয়াসেও তাঁদের সোফারেট Nun দুটিকে দিলেন।

গাড়ীর লণ্ঠনগুলো জ্বেলে দেওয়া হল। দ্রুত গতিতে চলার দরুণ ঘোঁড়ার গায়ের ঘাম থেকে ধোঁয়া উঠছিল। রাস্তা ঘন কুয়াশায় ভরে গিয়েছিল। ঐ আলোতে সব স্পষ্ট, চকচকে হয়ে উঠল। গাড়ী ছোটবার সাথে সাথে পথের দু'ধারে লণ্ঠনের আলো পড়ে মনে হতে লাগল যেন জমাট মাটিঢাকা বরফ নিজ হতেই ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

অন্ধকারে গাড়ীর ভিতরে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ বুল-দ্য-সুইফ ও করনুদেৎ-এর মধ্যে একটু গাঁ ঘেসাঘেসি হচ্ছে বোধ হল। লোয়াসেও অন্ধকারেই দৃষ্টি চালিয়ে দেখতে পেলে, যেন ঐ

লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটি নিঃশব্দে ছুঁড়ে দেওয়া একটা কিল থেকে গা বাঁচাবার জন্য সরে বসল।

রাস্তার উপরে জায়গায় জায়গায় দু'একটা আলো দেখা যেতে লাগল। এতক্ষণে টোটে পাওয়া গেল। এগার ঘণ্টা ধরে গাড়ী চলেছে; আর পথে ঘোঁড়ার দানা খাবার ও দম নেবার জন্য বার চা'রেক থামতে হয়, তাতে গেল দু'ঘণ্টা একুনে এই তের ঘণ্টা সময় লেগেছে এই পথটুকু আসতে। সহরে ঢুকে গাড়ী হোটেল-দ্য-কমার্সের সুমুখে থামল।

অমনি চট করে দরজা খুলে গেল। পরিচিত একটা শব্দ কানে আসতেই যাত্রীরা আঁৎকে উঠল, শব্দটা হচ্ছে মাটিতে তলওয়ারের খাপ ছেঁচড়ানোর; সাথে সাথেই জার্ম্মান ভাষায় একটা লোক কি যেন বললে।

গাড়ী থেমে গেলেও কারত্ত নামবার রকম দেখা গেল না— ভাবটা এই যে নামলেই বুঝি তাদের প্রাণ যাবে। কণ্ডাকটার এসে তার লণ্ঠনটা তুলে ধরতে গাড়ীর ভিতরটা আলো হয়ে উঠল,—আর নজরে পড়ল যাত্রীদের আতঙ্কের চেহারা—হাঁ-করা মুখ ও ভয়ে ও বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখ।

আর দেখা গেল গাড়ীর কাছেই দাঁড়িয়ে আছে অল্প বয়সের এক জার্ম্মান অফিসার,—লম্বা শুক্‌নো, ফরসা তার চেহারা। মেয়েদের গায়ের করসেট যেমন করে এঁটে থাকে, তেমনি আঁটা তার য়ুনিফরম। টুপীটা মাথায় দিয়েছে, ইংরেজি হোটেলের খানসামার মত করে। সব চেয়ে অদ্ভুত দর্শন তার খোঁচা খোঁচা গোঁফের তাড়া।

সে আলসেসীয় ফরাসীতে যাত্রীদের নামতে বললে—অতি ভারী গলায়—"আপনাদের নামতে আজ্ঞা হোক্" ইত্যাদি।

সকলের আগে নামলেন Nun দুটি, কারণ সব রকমের আদেশ অনুজ্ঞা মাথা পেতে পালন করতে তাঁরা অভ্যস্ত। তারপর কাউণ্ট ও কাউণ্টেস, ম্যাসে ও মাদাম কারে-লামাডোঁ নামলেন। লোয়াসেও তার অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ঠেলে দিয়ে নামল। ম্যাটিতে পা দিয়েই সে অফিসারকে বললে—"নমস্কার মশাই", অবশ্য এই নমস্কারের মধ্যে ভদ্রতার চাইতে খোসামোদই বেশী ছিল। অফিসার পাল্টা ভদ্রতা না করে নীরবে তার দিকে চেয়ে দেখল—যার হাতে সব ক্ষমতা, ভদ্রতা করা তার পক্ষে অনাবশ্যক।

করনুদেৎ ও বুল-দ্য-সুইফ দরজার একদম নিকটে ছিল, কিন্তু নামবার বেলায় সবার শেষে তারা নামল অত্যন্ত গম্ভীর ও উদ্ধত ভাবে, শত্রুর সুমুখে যেমন ভাব দেখাতে হয়। স্থূলকায় মেয়েটা শান্ত স্থির থাকবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল, আর আমাদের ডেমোক্রাট তার লাল্‌ছে দাড়ি কাঁপিয়ে ট্রাজিক চেহারা করে রইল। তাদের মনের ইচ্ছা যে শত্রুর সম্মুখে এমনি ভঙ্গী করে তারা দাঁড়ায় যাতে করে দেশের মানের কিছু খর্ব্বতা না হয়—কারণ, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তারা সকলেই স্বদেশের যে এক একটি প্রতিনিধি এটা মনে করা যেতে পারে। সঙ্গের অন্যান্য যাত্রীদের আদেশ পালনে অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে, বুল-দ্য-সুইফ গাড়ীর বাকী রমনী-দের চাইতে বেশী উদ্ধতভাবে চেয়ে দেখতে লাগল, সকলের দৃষ্টান্ত স্থানীয় হওয়া উচিৎ বিবেচনা করে। আর করনুদেৎ রাস্তায় খালকাটা থেকে সুরু করে, শত্রুর যে সব বিরুদ্ধ আচরণ এ যাবৎ করে এসেছে, ভাব ভঙ্গিতে সেইটে বজায় রাখতে চেষ্টা করলে।

যাত্রীরা হোটেলের প্রকাণ্ড ঘরটায় গিয়ে বসে, অফিসারকে

প্রধান সেনাপতির সই-করা ছাড়পত্র দেখতে দিলে। তাতে প্রত্যেকের নাম, ধাম, পেশা ও চেহারার বর্ণনা ছিল। অফিসার সেখানি পড়ে, অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যেকের সাথে লিখিত বিষয়গুলি মিল করে করে হঠাৎ বলে উঠল—"ঠিক হয়েছে." তারপর সে চলে গেল।

এতক্ষণে তারা হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন। সকলের ক্ষিদে আবার চেগে উঠেছিল। খাবার হুকুম দেওয়া হল। খাবার তৈয়েরী হতে তখনও আধঘণ্টা দেরী, সকলে সেই অবসরে শোবার ঘর গুলো দেখে নিতে গেলেন।

তারপর টেবিলে খাবার দেওয়া হল। এমন সময়ে হোটেলের কর্ত্তা স্বয়ং এসে হাজির। সাবেক কালে সে ছিল ঘোঁড়ার ব্যবসায়ী,—দেখতে মোটা, হাঁপানি রোগগ্রস্থ, সর্ব্বদাই হাঁস ফাঁস করছে, কাশছে, গলা থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বেরোচ্ছে। তার নাম কোলেনভি।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "মাদমোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট ?"

—বুল-হ্য-সুইফ কেঁপে উঠল। বললে, 'আমি"।

—মাদমোয়াজেল প্রুসীয় অফিসার এখনই আপনাকে ডাকছেন।

—আমাকে ?

—আপনাকে, যদি আপনিই মাদামোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট হন।

সে চিন্তিত হল, কিছুক্ষণ ভেবে বললে, "খুব সম্ভব আমাকেই ডাকছেন, কিন্তু আমি যাব না"।

চারদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল, সকলেই আলোচনা করতে লাগলেন এই ডাকবার কারণ কি হতে পারে। কাউণ্ট তার কাছে

গিয়ে বললেন, "মাদাম একাজটা আপনার অন্যায় হল। কারণ, এই অবাধ্যতার জন্য হয়তঃ শুধু আপনার উপর নয়, দলের সকলের উপরেই কোন গুরুতর অত্যাচার হতে পারে। যারা বলবান তাদের বাধা দেওয়া সব সময়েই যুক্তিসঙ্গত নয়। এই ব্যবহারের ভিতর কোন আশঙ্কার কারণ না থাকাই সম্ভব। হয়তঃ খুঁটিনাটি কোন নিয়ম কানুনের ভুল ভ্রান্তি ঘটেছে"।

তখন সকলেই সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি, উপদেশ ইত্যাদিতে তাকে বুঝিয়ে তুললেন, কারণ সকলেরই জানা ছিল যে বর্ত্তমান অবস্থায় ইঙ্গিত মাত্রে যে কোন বিপদাশঙ্কা করা যেতে পারে। শেষে সে বললে, "জানবেন যে কেবল আপনাদের অনুরোধেই আমি যাচ্ছি"।

কাউণ্টেস তার হাত ধরে বললেন, "এজন্য আমাদের ধন্যবাদ"।

সে উঠে গেল। সকলে তার জন্য সবুর করতে লাগলেন, প্রত্যেকেই দুঃখ করতে লাগলেন যে ঐ বদ্‌মেজাজী রুক্ষ স্বভাব মেয়েটাকে না ডেকে, কেন তাকে ডাকা হল না। যদি তাকে ডাকা হত তবে কেমন করে কি-কি তিনি বলতেন মনে মনে সেই সব ঠিক করতে লাগলেন।

মিনিট দশেক পরেই সে যখন ফিরল তখন রাগে তার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে, আর কেবল সে বলছে—"নচ্ছার, হতভাগা"—।

কি বৃতান্ত জানবার জন্য সকলে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু সে মুখ বুঁজে গোঁজ হয়ে থাকল। কাউণ্ট যখন নিতান্ত চেপে ধরলেন তখন গম্ভীরভাবে বললে,—"আর অনুরোধ করবেন না, আমি কিছুই বলতে পারব না"।

তখন সকলে খেতে বসে গেলেন, বড় রকমের একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, তার সঙ্গে বেরল, বঁধা-কপির গন্ধ। যাহোক এ গোলযোগ সত্ত্বেও বেশ ফূর্ত্তির সাথে খাওয়া দাওয়া চলল। লোয়াসেও দম্পতী ও দুই Nun কেসিডার সুরা পান করতে লাগলেন বাকী সকলে অন্য মদ নিলেন, করমুন্তেৎ নিল বিয়র।

তার অভ্যাস ছিল কায়দা করে বোতলের মুখ খোলা,—খোলা মুখ দিয়ে ফেনা বের করা, তারপর গেলাসটা, বাতি আর তার চোখের মধ্যে উঁচু করে তুলে ধরে, মদের রঙ মালুম করবার জন্য সেটা বিচক্ষণ ভাবে দেখা। যখন সে গেলাসে চুমুক দিত তখন তার বিয়র-রঙিন লম্বা লম্বা দাড়ি আনন্দে একটু একটু কাঁপতে আরম্ভ হত। আর একদৃষ্টে সে চেয়ে দেখত তার বোতলটা ঠিক আছে কিনা। তখন তার ভাব দেখে মনে হত যে যে-মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে সংসারে জন্মেছে সেই কাজটি যেন সে সত্যই করছে। সকলেই বলত যে, তার জীবনের সেরা বাতিক, বিয়র ও রেজেল্যুশন। এই দুইয়ের মধ্যে সে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতিয়ে ছিল, কাজেই মদের গেলাসে চুমুক দেবার সময় অপর বাতিকটির কথা স্বতই তার মনে উদয় হত।

ম্যাঁসে ও মাদাম ফোলোঁভি টেবিলের এককোণে খেতে বসলে ভাঙ্গা এঞ্জিনের মত হাঁস ফাঁস শব্দ করতে করতে, ম্যাঁসে কোন গতিকে হাত চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কথা বলা একেবারেই সম্ভব ছিল না। কিন্তু মাদাম তাঁর রসনাকে একটুও বিরাম দিচ্ছিলেন না। তিনি অনবরত বকে যাচ্ছিলেন কেমন করে প্রুসীয়ানেরা এল, কি তারা করলে, কি তারা বললে ইত্যাদি। এসেই ওরা টাকার দাবী করে, এজন্য একচোট গাল দিয়ে নিলেন, তারপর তাঁর দুই ছেলে

সৈন্য দলে আছে এজন্য আরেক চোট গাল দিয়ে নিলেন। কাউণ্টেসকে উদ্দেশ করেই মাদাম কথা বলছিলেন—অতখানি উচ্চ পদবীর মহিলার সাথে কথা বলাও যে একটা গৌরবের বিষয়।

তারপর গলা একটু নীচু করে গোপনতর কথাগুলো বলতে লাগলেন। তাঁর স্বামী মাঝে মাঝে—"আপনার মুখটা বন্ধ করলেই ভাল হত মাদাম ফোলাঁভি"—এই বলে বাধা দিতে চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু মাদাম সে কথা কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করে কথা কয়েই চললেন—

—"হ্যাঁ মাদাম, ঐ হতভাগা গুলো ওরা খেতেই বা জানে কি ছাই? কেবল আলু আর শূয়োর, শূয়োর আর আলু! আর বেটারা যে কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তা শুনলে ঘেন্নায় নাক সিটকবেন! ওদের কুচ কাওয়াজ যদি দেখতেন—একটা মাঠের মধ্যে গিয়ে সব গুলো জড় হবে—তারপর চলবে একবার আগে, একবার পিছে, একবার এদিকে একবার ওদিকে—এইত ব্যাপার! এর চেয়ে বাড়ী বসে হাল লাঙ্গল চষলে বা পথঘাট তৈয়েরীর কাজ করলেও ভাল হ'ত। এইসব অকেজো সৈন্য সামন্ত দিয়ে কার কি লাভটা হয় শুনি? তারা যেখানে সেখানে মানুষ খুন করে' বেড়াবে আর যত গরীব বেচারারা তাদের পেট ভরাবে। আমি ত মুখ্যু সুখ্যু বুড়ো মেয়ে মানুষ মাত্র—কিন্তু সকাল সন্ধ্যা ওদের ঐ লাফ ঝাঁপ দেখে আমারও মনে হয়—সংসারে কতলোক আছে যারা কি করে ভাল করবে, ভাল হবে, তাই চেষ্টা করছে, আর ঐ যে হতভাগাগুলো কিসে মন্দ করবে তারই তল্লাসে ফিরছে। আচ্ছা, প্রুসীয় হোক, ইংরেজ হোক, আর ফরাসি হোক্, মানুষ মারা কি পাপ নয়? কেউ যদি

অন্যায় করে, পাল্টা যদি তার প্রতিশোধ নেও সকলে তোমাকে দুষবে—আর চোর ডাকাতের মত, যে যত মানুষ খুন করবে, তাকে তত ভাল ভাল খেলাত, ইনাম দেওয়া হবে? এ ব্যবস্থার মহিমা আমার মাথায় ঢোকে না বাপু!

করনুদেৎ বললে, "যুদ্ধ হচ্ছে বর্ব্বরতা যখন শান্তিপ্রিয় নিরীহ প্রতিবেশী জাতকে খামকা আক্রমণ করা হয়; কিন্তু স্বদেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ পুণ্য কার্য্য!"

বুড়ো স্ত্রীলোকটি মাথা নামিয়ে বললে,—

"হ্যাঁ আত্মরক্ষার কথা আলাদা কথা? কিন্তু যে সব রাজা রাজড়া মজা দেখবার জন্যই লড়াই বাধায়, তাদের মেরে ফেলা উচিৎ নয় কি"?

করনুদেৎ সেৎসাহে বলে উঠলে,—"বাহবা! বেশ বলেছেন"।

ম্যাঁসে কারে-লামাডো গভীর চিন্তামগ্ন হলেন। বড় বড় নামজাদা সেনাপতিদের তিনি রীতিমত ভক্তি করতেন—ঐ মূর্খ স্ত্রীলোকটি সহজ বুদ্ধিতে যা বললে সেই কথাটা তিনি ভাবতে লাগলেন। বাস্তবিক অতগুলো লোককে নিষ্কর্ম্ম রেখে দেশের ধনাগমের কতখানি ক্ষতি করা হচ্ছে ও কতখানি শক্তির অপচয় হচ্ছে,—তার জায়গায় ওদের বড় বড় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকর নানাকাজে,—যা হয়ত বহুশত বৎসরেও শেষ হবে না,—লাগিয়ে দিলে কত মঙ্গল হয়।

এদিকে লোয়াসেও নিজের জায়গা থেকে উঠে গিয়ে হোটেল ওয়ালার সাথে নীচু গলায় আলাপ করতে বসলে। লোয়াসেওর রসিকতায় ঐ মোটা মানুষটি হেসে, কেশে, থুথু ফেলে একটা

বিতিগিচ্ছি কাণ্ড করে তুললে—তার এই মোটা ভুঁড়ি ফূর্ত্তিতে নড়ে নড়ে উঠতে লাগল। শেষটা হল এই যে, সে স্বীকার করে ফেললে যে বসন্তকালে প্রুসীয়ানেরা চলে গেলে সে লোয়াসেওর কাছ থেকে ছয় পিপে বরদ্যো মদ কিনবে।

সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছিলেন, আহার শেষ হতেই শয্যা আশ্রয় করতে ছুটলেন।

লোয়াসেওর নজরে দু'একটা জিনিস পড়েছিল। সে আগে তার স্ত্রীকে শুইয়ে দিলে,—তারপর দরজার ফুটোয় একবার চোখ, একবার কান লাগিয়ে, কোন মজা দেখা কি শোনা যায় কিনা তাই আবিষ্কার করবার মতলব করলে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক বাদে খস্ খস্ শব্দ শুনে ভাল করে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলে যে বুল-দ্য-সুইফ একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে করিডোরের শেষদিক পানে যাচ্ছে। শাদা লেশ লাগানো নীল কাশ্মিরী নাইট-গাউন তার গায়ে, আর তাতে করে তাকে আরও মোটা সোটা দেখাচ্ছে। করিডোরের পাশের একটা দরজা হঠাৎ খুলে গেল। বুল-দ্য-সুইফ ফেরবার সময় দেখলেন করনুদেৎ সার্ট গায়ে তার পিছু পিছু আসছে। খুব আস্তে দু'জন কথা কইছিল, তারপর থেমে গেল। মনে হল বুল-দ্য-সুইফ তার ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে করনুদেৎ-এর পথ আটকাচ্ছে। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাদের কথাবার্ত্তা লোয়াসেওর কানে আসছিল না। কিন্তু খানিক বাদে দু'জনের গলা চড়ে উঠতে লোয়াসেও কিছু কিছু শুনতে পেল।

করনুদেৎ জিদ করতে লাগল, "তুমি বড় বেকুব, খামকা এমন করছ কেন"?

বুল-ছ-সুইফ রেগে উঠে বললে,—"আজ্ঞে না; যখন তখন-এসব চলে না বিশেষতঃ এখানে—অত্যন্ত লজ্জার বিষয়"।

করনুদেৎ কথার অর্থ না বুঝতে পেরে বললে, "কেন"?

আরও চটে গিয়ে গলা চড়িয়ে বুল-ছ-সুইফ বললে,—"কেন? কেন তা কি বোঝ না? এ বাড়ীতে প্রুসীয়ানেরা থাকতে,—হয়ত পাশের ঘরেই তাদের কেউ না কেউ রয়েছে"।

করনুদেৎ চুপ করে গেল। সাধারণ একটা বেশ্যার এই ব্যবহার, যে শত্রুর কাছে থাকতে কোন আমোদ আহ্লাদ অকর্ত্তব্য! এতে তার স্তিমিত প্রায় পাট্রিয়টিক আত্মা চেগে উঠল,—ফলে সে এক লাফে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

লোয়াসেওর মনে ভারি ফূর্ত্তি বোধ হল। সে একা একাই ঘরের মধ্যে—এক চোট নেচে নিয়ে, স্ত্রীকে জাগিয়ে তুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

সমস্ত বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কিন্তু একটু পরেই বাড়ীর উপর কি নীচ একটা দিক থেকে উননের উপর ঢাকা দেওয়া কেৎলীর শব্দের মত ভারি গোছের ও একঘেয়ে ঘড় ঘড় শব্দ হতে লাগল। বোঝা গেল ম্যাঁসে ফোলোঁভি—ঘুমুচ্ছেন।

ঠিক হয়েছিল যে পরদিন সকালে আটটায় এখান থেকে রওনা হওয়া হবে, তাইতে খুব ভোরেই সকলে বাইরে এসে জুটলেন। কিন্তু দেখা গেল আঙ্গিনার এক কোণে আগাগোড়া বরফ-ঢাকা হয়ে গাড়ীখানা খাড়া করা রয়েছে—তার ঘোড়াও নেই, কোচওয়ানও নেই। আস্তাবলে, এখানে-সেখানে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঘোড়া বা চালকের দেখা মিলল না। তখন বাইরে এদিব-ওদিক খুঁজে

দেখবার মতলবে সকলে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন। বেরিয়েই সুমুখে নজর পড়ল, গির্জ্জা ও তার দুইদিকে কতকগুলি নীচু বাড়ী ও তাতে দু'চারজন প্রুসীয়ান সৈন্য। প্রথমে যাকে তাঁরা দেখলেন, সে বসে আলু ছাড়াচ্ছে। দ্বিতীয় জন একটু দূরে নাপিতের দোকান ধুয়ে সাফ করছে। আরেকজন যার দাড়ী একেবারে চোখ পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেছে, সে দুই হাঁটুর উপর একটি ছোট মেয়েকে নিয়ে, চুমো খেয়ে খেলা দিয়ে তার কান্না থামাতে চেষ্টা করছে। দেখতে মোটা-সোটা সব চাষার গিন্নীরা, হাত মুখ নেড়ে ইসারায়, তাদের অনুগত ও বাধ্য বিজিতাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, কি কি কাজ তাদের করতে হবে,—যথা কাঠ চেলা করা, সুপ তৈয়ারী, কাফি গুঁড়ো করা ইত্যাদি। একজন আবার তার অতি বৃদ্ধা, অক্ষম বাড়ীওয়ালীর কাপড় চোপড় কেচে সাফ করে দিচ্ছে।

কাউণ্ট আশ্চর্য্য বোধ করলেন। পাদরীর বাড়ী থেকে চার্চ্চের একটি কর্ম্মচারী বেরিয়ে আসছিল,—তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সেই বুড়োটি বললে, "ওঃ! এদের কথা বলছেন? এরা আদপেই হারামজাদা নয়, যদি খাঁটি প্রুসীয়ানরা তাই বটে। এরা সকলেই বাড়ীতে স্ত্রী ও কাচ্চা বাচ্চা ফেলে এসেছে,—লড়াইতে ওরা কোন আহ্লাদ বোধ করে না। ওদের বাড়ীর মেয়েরাও ওদের জন্য কান্না-কাটি করছে, যেমন আমাদের সকলে করছে। লড়াইয়ের ফলে জেতা বিজেতা দুই জাতির দেশেই এমনি চমৎকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে এখনও তেমন কিছু খারাপ ব্যবহার করা হয়নি আর লোক গুলো ভাল, ঘরের মানুষের মতই কাজ কর্ম্ম করে,—সকলেই একরকম বনি বনাও করে আছে। দরিদ্র বলেই এরা

পরস্পরের সাহায্য আশা করে, আর বড় লোক, ধনী যারা, তারা কেবল লড়াই বাধিয়ে মজা দেখেন।

জেতা বিজেতা দুই দলের মধ্যে এমনতর সদ্ভাবের পরিচয় পেয়ে করনুদেৎ চটে গিয়ে আর না এগিয়ে হোটেলের দিকে ফিরলে। লোয়াসেও একটু হেসে রসিকতা করলে, ম্যাঁসে কারে-লামাডোঁ গম্ভীর ভাবে একটা মন্তব্য করলেন। কিন্তু কোথাও কোচওয়ানের দেখা মিলল না। শেষটায় গাঁয়ের কাছে তাকে পাওয়া গেল, সে অফিসারের আর্দ্দালীর সাথে দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক টেবিলে বসে পান ভোজন করছে। কাউণ্ট তাকে বললেন,

—তোমাকে আটটায় গাড়ীতে ঘোড়া জুৎতে বলা হয়েছিল না?

—হাঁ; তারপর আমাকে আরেকটা আদেশও দেওয়া হয়।

—কি আদেশ?

—গাড়ীতে ঘোড়া যেন না জোতা হয়।

—কে তোমাকে এ আদেশ দিয়েছে?

—প্রুসীয়ান কমণ্ডাট মহাশয়।

—কেন?

—আমি কিছু জানিনে—বরং তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন-গে। আমাকে গাড়ী জুৎতে নিষেধ করা হল আমি গাড়ী জুৎলেম না। ব্যস্।

—তিনি নিজ মুখে তোমাকে এ হুকুম দিয়েছেন?

—না মশাই হোটেলওয়ালা তাঁর হয়ে বলেছে।

—কখন?

—কাল সন্ধ্যায় যখন শু'তে যাই।

ভদ্রলোক তিনজন অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে ফিরলেন।

ম্যাঁসে ফোলেঁভিকে খুজতে গিয়ে তাঁরা জানলেন হাঁপানির জন্য সে দশটার আগে বিছানা থেকে ওঠে না। তার বিশেষ নিষেধ ছিল যে ঘরে আগুণ লাগা কিম্বা আর যে কারণেই হোক্ তাকে ঐ সময়ের আগে যেন জাগানো না হয়।

তাঁরা অফিসারের সাথে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু অফিসার যদিও ঐ হোটেলেই থাকত, তার সাথে দেখা হওয়া একেবারে অসম্ভব ছিল। ম্যাঁসে ফোলেঁভি ছাড়া আর কারও সাধারণ ব্যাপার বিষয়ে কথা বলবার অনুমতি ছিল না। বাধ্য হয়ে সকলকে অপেক্ষা করতে হল। স্ত্রীলোকেরা আপন আপন ঘরে চলে গেলেন, যা করে হোক সময়টা ত কাটাতে হবে।

করনুদেৎ বসবার ঘরে প্রকাণ্ড চীমনীর কাছে গিয়ে বসল; তাতে দাউ দাউ করে আগুণ জ্বলছিল। সেখানে কাফের ছোট একটা টেবিল ও বিয়ারের ভাঁড় নিয়ে এসে, নিজের পাইপটা বের করে, সময় কাটাবার উপায় করে নিল। ডেমোক্রাট দলের মধ্যে করনুদেৎ-এর পাইপ প্রায় করনুদেৎ-এর সমান খ্যাতি লাভ করেছিল, করনুদেৎ-এর মত লোকের কাজে লেগে সে দেশের কাজই করেছে, এই রকমটা সকলের মনের ভাব। সে পাইপটির চেহারা ভারি চমৎকার, এনামেল করা তার প্রভুর দাঁতের মতই কাল, ঝকঝকে চকচকে, একটু বাঁকা, তাম্রকুট সুরভিত। তার পাইপের সাথে করনুদেৎ-এর এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে মনে হত সেটা যেন করনুদেৎ-এর দেহেরই একটা অঙ্গ, তার মুখের সম্পূর্ণতা সম্পাদক ও শোভাবর্দ্ধক আবশ্যকীয় অবয়ব। নড়ন চড়ন বিহীন হয়ে গম্ভীর

ভাবে বসে কখনো সে চীমনীর জ্বলন্ত আগুনের উপর দৃষ্টিপাত করছিল, কখনো বা ভাঁড়ের সফেন বিয়রের উপর নজর দিচ্ছিল। থেকে থেকে এক চুমুক করে মদ খেয়ে, লম্বা সরু সরু আঙ্গুল-গুলো মাথার অপরিষ্কার লম্বা চুলের মধ্যে বুলিয়ে যাচ্ছিল, গোঁফের সাথে যে মদের ফেনা লেগে যাচ্ছিল, সে তা চুষে নিচ্ছিল।

লোয়াসেও একবার হেঁটে হুঁটে শরীরটাকে চাঙ্গা করে তোলবার অছিলায় ঐ জায়গায় খুচরা মদের দোকানে নিজের মাল বিক্রয়ের চেষ্টাতে বেরিয়ে গেল। কাউণ্ট ও ম্যাঁসে কারে-লামাডো পোলি-টিকস আলোচনা করতে লাগলেন। ফ্রান্সের ভবিষ্যত তাঁদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। একজনের মত যে ভবিষ্যৎ অর্লিয়ানিষ্ঠ দলের হাতে, অপরের বিশ্বাস যে দৈব প্রেরিত কোন মহাপুরুষ ও বীর, যিনি দেশের চরম দুর্দ্দশার সময় হঠাৎ দেখা দেবেন, যা কিছু করবার তাঁরই হাতে। সে হয়তঃ একজন দ্বিতীয় "দু-গেসাক্লিন" বা "জঁান ডার্ক" বা প্রথম "নাপোলিয়ঁ।" আহা! সম্রাটের ছেলেটি যদি অত অল্প বয়সের না হত! করনুদেৎ গম্ভীর ভাবে এইসব কথাবার্ত্তা শুনছিল—যেমন তাচ্ছিল্যের সাথে দৈবজ্ঞ, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্যক্তি এই ধরণের কথাবার্ত্তা কানে তুলে থাকে। তার পাইপের গন্ধে ও ধোঁয়ায় ঘর ভরে উঠেছিল।

এদিকে দশটা বাজতে ম্যাঁসে ফোলেঁভি দেখা দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল। তিনি একটুও অদল বদল না করে বার তিনেক এই একই কথাগুলো শুনিয়ে দিলেন।—"অফিসার মহাশয় আমাকে বললেন, 'ম্যসেঁ ফোলেঁভি, আপনি উপস্থিত যাত্রীদের

গাড়ীতে কালকে ঘোড়া জুৎতে নিষেধ করে দেবেন। আমার বিনা হুকুমে যেন তারা না যায়।' শুনলেন ত? ব্যস্।"

তখন তাঁরা অফিসারের সাথে দেখা করতে চাইলেন। কাউণ্ট তাঁর কার্ড পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাঁসে কারে-লামাডোঁ সেই কার্ডের উপর নিজের নাম ও সবগুলো খেতাব লিখে দিলেন। অফিসার বলে পাঠালে যে তার প্রাতভোজন শেষ হয়ে গেলে, অর্থাৎ একটার সময় সে তাঁদের বক্তব্য শোনবার অবসর পাবে।

মহিলারা নেমে এলেন। সকলেই চিন্তিত ও ব্যাকুল। যেমন তেমন করে' খাওয়া দাওয়া হল। বুল-দ্য-সুইফকে দেখে মনে হল তার বোধহয় অসুখ করেছে, সে ভয়ানক অসোয়াস্তি বোধ করছে।

তাঁদের কাফি পান শেষ হয়েছে, এমন সময় আর্দ্দালী এসে ভদ্র-লোক দু'জনকে ডাকল।

লোয়াসেও তাঁদের দু'জনের সাথে যোগ দিল। তাঁরা দলভারী করবার জন্য—করনুদেৎকেও ডাকলেন কিন্তু সে গর্ব্বিত ভাবে জানিয়ে দিল যে সে জীবনে কখন জার্ম্মাণদের সাথে সন্ধি করে নি। টান হয়ে চীমনীর কাছে বসে সে আরেক জাগ্ বিয়র আনবার হুকুম দিলে।

তিনজন উপরে উঠে গেলেন। হোটেলে সব চেয়ে ভাল ঘরটিতে অফিসার থাকত, সেই ঘরে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হল। অফিসার একখানা আরাম-চেয়ারের উপর শুয়ে চীমনীর উপর দুই পা রেখে তাঁদের সাথে দেখা করলে। তার গায়ে জ্বলজ্বলে রংয়ের ঢিলা ইজার, সেটা সম্ভবতঃ কোন সৌখিন ভদ্রলোকের

পরিত্যক্ত ঘর থেকে চুরি করা হয়েছে, আর মুখে একটা লম্বা পোরসিলেনের পাইপ। সে উঠে তাঁদের অভ্যর্থনা করলে না, নমস্কার করলে না, এমন কি তাঁদের দিকে একবার তাকালে না পর্য্যন্ত। যুদ্ধে জয়ী সৈন্যের ছোটলোকী নবাবীর এমন চূড়ান্ত উদাহরণ দেখা যায় না। কিছুক্ষণ পরে সে বল্‌লে,

—কি চাই আপনাদের ?

কাউণ্ট বললেন,—আমরা এখান হতে বিদায় হতে চাই।

—না।

—কি কারণ জানতে পারি কি ?

—কারণ, যাওয়া হবে না।

—দেখুন আপনাদের প্রধান সেনাপতি মহাশয়, দীয়েপ পর্য্যন্ত যাবার জন্য নিজ হাতে আমাদের ছাড়পত্র দিয়েছেন। আশাকরি আপনার বিরক্তিকর কোন কাজ আমাদের দ্বারা করা হয়নি।

—যাওয়া হবেনা, ব্যস। আপনারা এখান থেকে যেতে পারেন। তাকে নমস্কার করে তিনজনে নেমে এলেন।

বিকেল বেলায় সকলের অসোয়াস্তি বেড়ে উঠল। জার্ম্মাণটার এই খেয়ালের হদ্দ মুদ্দ কেউ কিছু বুঝতে পারলেন না। এক একজন এক এক রকম ভাবতে লাগলেন। সেই ঘরে বৈঠক বসল—প্রত্যেকের মাথায় এক একটা উদ্ভট কল্পনা। কেউ বলে জামিন স্বরূপ তাদের আটকে রাখা হবে—কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ? কেউ বললে যে তারা যুদ্ধ-বন্দী। কেউ বল্‌লে যে তাদের কাছ থেকে মোটারকম খালাসী টাকা আদায় করা হবে। এই কথায় সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। যারা যত বেশী ধনী, তারা তত ভয়

খেল। তাঁরা স্পষ্ট চক্ষে দেখতে লাগলেন যে উদ্ধত সৈন্য বেটারা তাঁদের মুক্তির বিনিময়ে থলে থলে টাকা কেড়ে নিচ্ছে। সকলে মাথা খুঁড়ে ভাবতে লাগলেন, কি রকম মিষ্টি করে মিথ্যা বললে, কি রকমে দারিদ্র্যের—একেবারে হত দারিদ্র্যের, ভাণ করলে ঐ দুষমণদের মন একেবারে ভেজানো যাবে। লোয়াসেও তার ঘড়ীর চেইন খুলে নিয়ে পকেটে লুকিয়ে ফেললেন। রাত্রে সকলের ভয় ভাবনা আরও বৃদ্ধি পেল। আলো জ্বালা হল। ডিনারের তখনও দু ঘণ্টা বিলম্ব দেখে মাদাম লোয়াসেও বললেন তাস খেলাতে মনটা ত ব্যস্ত থাকবে। সকলে রাজি হলেন। করনুদেৎও ভদ্রতা করে পাইপ নিবিয়ে খেলায় যোগ দিল।

কাউণ্ট তাস বেঁটে দিলেন। খেলার ঝোঁকে সকলের মনে যে ভয় ছিল সেটা চাপা পড়ে গেল। করনুদেৎ দেখছিল যে লোয়াসেও গৃহিনী তাসে কেবল চুরির চেষ্টায় আছেন।

তারপর খাবার টেবিলে যেতে যখন সকলে উঠে দাঁড়ালেন তখন ম্যাঁসে কোলেঁভি ফের দেখা দিলেন। মুখ থেকে পোড়া মাংসের মত গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে তিনি বল্‌লেন,—

—"প্রুসীয় অফিসার মশাই জানতে চাইছেন যে মাদামোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট তাঁর মত বদল করেছেন কি না।"

বুল-দ্য-সুইফ দাঁড়িয়েছিল, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ একেবারে লাল হয়ে উঠে রাগের চোটে কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলে না। শেষে একেবারে চেঁচিয়ে উঠলে,—

—"যান, সেই বদমাইস, সেই ছুঁচো, সেই নচ্ছার প্রুসীয়ানটাকে

বলুনগে যে আমি কখন রাজি হব না—কখন না, কখন না, কখন না, শুনছেন ?"

মোটা লোকটা বেরিয়ে গেল। তারপর সকলে তাকে ঘিরে ধরে অনুরোধ, উপরোধ করতে লাগলেন, হোটেল-ওয়ালার এই আগমনের রহস্য জানবার জন্য। প্রথমে সে বলবে না বলে জিদ করলে; কিন্তু রাগের মাথায় সামলাতে না পেরে বলে ফেললে,—

—কেন ? ওটা কি চায় ? ও চায় যে রাত্রে আমি ও বেটার কাছে থাকি।

সকলের এত রাগ হয়েছিল যে কথাটা শুনে কেউ মুখ ফেরালেন না। করনুদেৎ ঠাস করে "জাগটা" টেবিলের উপর রাখতে গিয়ে সেটা ভেঙ্গে ফেললে। এর অর্থ হচ্ছে সেই দুশ্চরিত্র লোকটার উপর সকলের অসন্তোষ জ্ঞাপন, ক্রোধের অভিব্যক্তি, বাধাপ্রদানে সকলের মধ্যে একতা স্থাপন—যেন বুল-দ্য-সুইফের উপর এই নির্য্যাতন সকলের গায়েই বিঁধেছে। কাউণ্ট বিরক্তির সাথে মন্তব্য করলেন যে এই লোকগুলো প্রাচীন কালের বর্ব্বরদের মত ব্যবহার করছে। সবার চেয়ে মহিলারাই বুল-দ্য-সুইফের উপর সদয় ও প্রণয়ের ভাব দেখাতে লাগলেন, Nun দুটি লাঞ্চের টেবিলে দেখা দেন নি—তাঁরা এখন তার মাথায় একটা করে চুমা খেলেন, কোন কথা মুখ দিয়ে বের করলেন না।

প্রথমে উত্তেজনা থেমে গেলে সকলে খেতে বসলেন। কথাবার্ত্তা তেমন হল না, সকলেই চিন্তামগ্ন।

মহিলারা যথাসময়ে নিজ নিজ কক্ষে চলে গেলেন। পুরুষেরা তাস নিয়ে বসলেন। ম্যাঁসে কোলেভিঁকে আহ্বান করা হল এই

মতলবে যে হয়ত জেরা করে তার কাছ থেকে জানা যাবে, কোন কল কৌশলে প্রুসীয়ান অফিসারকে তাদের ছেড়ে দেবার হুকুম দিতে রাজি করা যায় কিনা ? কিন্তু ম্যাঁসে ফোলেভিঁ তার হাতের তাস নিয়েই ব্যস্ত,—কারও কোন কথা কাণে না তুলে ও কোন জবাব না দিয়ে সে কেবলই বলতে লাগল—"হাতের তাস দেখুন, আপনারা খেলুন"। খেলাতে সে এতই মগ্ন হয়ে গেল যে অভ্যাস মত থু-থু ফেলবার কথা পর্য্যন্ত তার ভুল হয়ে গেল। বুক থেকে ঘড় ঘড় শব্দ বের হয়ে হাঁপানির সবগুলো রাগ রাগিনী বাজাতে থাকল, ভস্ ভস্ থেকে চিঁচিঁ পর্য্যন্ত।

তার স্ত্রী একদফা ঘুমিয়ে নিয়ে তাকে ডাকতে এল, সে গেল না। সে একাই চলে গেল কারণ তার অভ্যাস ছিল সূর্য্য ওঠবার সাথে সাথে শয্যা ত্যাগ করা, কিন্তু তার স্বামী নিশাচর, রাত্রিটা বন্ধু বান্ধবের সাথে কাটিয়ে দিতে পারলে বেশী খুসী।—"আমার ডিম সিদ্ধ আগুণের কাছে রেখে দিও,"– স্ত্রীকে এই কথা বলে সে খেলায় মন দিল। সকলে যখন দেখলেন যে লোকটার কাছ থেকে কিছুই আদায় হবে না, তখন "শোবার সময় হয়েছে", এই বলে খেলা ভেঙ্গে দিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলেন।

খুব সকালেই সকলে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। প্রত্যেকের মনে অনিশ্চিত আশা, ঐ ক্ষুদ্র আরামহীন হোটেল থেকে পালাবার জন্য ব্যাগ্রতা। কিন্তু হায়! ঘোড়া গুলো তখনো আস্তাবলে বাঁধা, কোচয়ান আগের মত অদৃশ্য। নিরাশ হয়ে সকলে সেই খানে গাড়ীর চার পাশেই বার কতক ঘুরলেন।

নীরবে প্রাতরাশ শেষ হল। ইতিমধ্যেই বুল-দ্য-সুইফের উপর

সকলের ভালবাসার ভাটা ধরেছিল ; রাত্রে নাকি বুদ্ধি পাকে, তাই সকাল বেলায় সকলেরি মতামত কিছু বদলে গিয়েছিল। ধর ও যদি রাত্রে টুক্ করে অফিসারের কাছ থেকে ঘুরে আসে, তা হলে সকালে উঠে বাঁকী সঙ্গীদের কেমন অবাক্ করে দিতে পারে! আর গোলযোগই বা এর মধ্যে কি আছে? কেইবা জানবে? আফসারকে বলে দিলেই হল যে তার সঙ্গীদের কষ্টে সহানুভূতি পরবশ হয়ে সে এতে বাধ্য হয়েছে, তা হলেই মান রক্ষা হয়? আর ওর নিজের কথা ধরলে, সেটাত কিছুই নয়।

কিন্তু এই কথাগুলো কেউ সাহস করে মুখ দিয়ে বের করলেন না।

বিকেলে বসে থেকে থেকে সকলের তি-তি বিরক্তি ধরে গেল। কাউণ্ট তখন প্রস্তাব করলেন যে গাঁ-য়ের ভিতর একবার ঘুরে আসা যাক্।

বেশ ভাল করে গায়ে কাপড় চোপড় দিয়ে ছোট দলটি বেরিয়ে পড়ল। বাঁকী থাকল করনুদেৎ ও Nun দুটি। করনুদেৎ আগুনের কাছে বসে রইল; Nun যুগলের সময়, চার্চ্চে বা পাদরীর গৃহেই কেটে যেত।

ঠাণ্ডা, দিন দিন বেড়েই চলছিল, সকলের নাক কান বরফ হয়ে গেল। পা হিমে ঝিম হয়ে গেল—এক পা এগোতেই ভয়ানক কষ্ট। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সেই একঘেয়ে, সীমাহীন সাদা মাঠ, যা দেখেই গায়ে শীত ধরে। বিরক্ত হয়ে সকলে ফিরে এলেন, মন ও প্রাণে যেন বরফে চাপ পড়েছে, এই ভাব নিয়ে।

স্ত্রীলোক চারজন আগে ও পুরুষ তিনজন পাছে, এই ভাবে সকলে চলছিলেন।

লোয়াসেও সমস্ত অবস্থা এক আঁচে বুঝে নিয়েছিল। সে হঠাৎ বলে উঠল যে "ঐ মাগীটা" আর কতদিন তাদের এমনি করে আটকে রাখবে। কাউণ্ট সব সময়ে ভদ্র, তিনি বললেন যে, কোনো লোক স্ত্রীলোকের কাছ থেকে এমন মর্ম্মঘাতী ত্যাগ স্বীকার, দাবী করতে পারেন না। সেটা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ম্যাঁসে কারে-লামাডো বললেন যে যে রকম শোনা যাচ্ছে, ফরাসীরা যদি দীয়েপ থেকে প্রতি-আক্রমণ করে', তবে সে সংঘর্ষ টোটের কাছে ভিতে হওয়াই সম্ভব, বাকী দু'জন এই কথা শুনে চিন্তিত হলেন।—"যদি পায়ে হেঁটে আমরা পালাই," লোয়াসেও এই কথা বললে। কাউণ্ট ঘাড় নাড়লেন। "এই বরফের ভিতর দিয়ে, স্ত্রীলোক সাথে নিয়ে,—কি যে বলছেন? তারপর তখনই পিছু পিছু লোক ছুটে দশ মিনিটের মধ্যে গ্রেপ্তার করে আনবে—তখন সম্পূর্ণরূপেই ঐ বেটাদের হাতে পড়তে হবে"। কথাটা ঠিক, সকলে চুপ করে রইলেন।

মহিলারা সাজসজ্জা সমন্ধে আলাপ করছিলেন—কিন্তু একটা বাধ বাধ ভাবের দরুণ সে আলাপ তেমন জমে উঠছিল না।

হঠাৎ দেখা গেল যে রাস্তার মাথায়—অফিসার আসছে। জমাট বরফের উপর দিয়ে বোলতার মত সরু কোমর ও দীর্ঘ দেহ য়ুনিফরমে ঢেকে সটান হয়ে, মিলিটারী কায়দা মাফিক সযত্নে পালিশ করা চকচকে বুট যাতে নষ্ট না হয় এজন্য দু'পা ফাঁক করে, সে পা টেনে টেনে হেঁটে আসছিল।

মহিলাদের পাশ দিয়ে যেতে মাথা নুইয়ে এবং অতিশয় তাচ্ছিল্যের সাথে পুরুষদের দিকে তাকিয়ে সে চলে গেল। তাঁদের

এই সম্ভ্রম বোধটুকু ছিল যে তাঁরা খাতির দেখাবার চেষ্টা কেউ করলেন না। যদিচ লোয়াসেও টুপী ওঠাবার জন্য হাতটা তুলেছিল।

বুল-দ্য-সুইফ কান অবধি রাঙা হয়ে উঠল; বাকী তিনজন বিবাহিতা মহিলা, বুল-দ্য-সুইফের সাথে এক সঙ্গে বেড়াতে অফিসার তাঁদের দেখলে—এতে মনে মনে অত্যন্ত অপমান বোধ করলেন,—কারণ, সে ও হতভাগীকে কি চোখে দেখে তাত আর কারও অজানা নেই।

তারপর সকলে তার সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করলেন,—তার গড়ন, তার মুখের চেহারা এইসব। মাদাম কারে-লামাডোঁ অনেক অফিসার দেখেছিলেন,—তিনি বিশেষজ্ঞের মত সমালোচনা করে বল্‌লেন, যে মন্দ নয়। তিনি আপশোষ করলেন যে সে ফরাসী নয়, কারণ তাহলে "হুসারের" পোষাকে তাকে চমৎকার দেখাত ও যত স্ত্রীলোক তার জন্য ক্ষেপে উঠত।

ফিরে এসে তার পর কি করা যাবে তা কারো মাথায় খেলল না। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে বসে কেউ কেউ গরম হয়ে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ও নীরবে ডিনার শেষ হয়ে গেল। সকলে উপরে উঠে গেলেন ঘুমিয়েই সময় কাটানো যায় কিনা দেখা যাক বলে।

পরদিন সকালে সকলে নেমে এলেন, ক্লান্ত মুখের চেহারা ও মনে নির্ব্বাক-ক্রোধ নিয়ে। মহিলারা বুল-দ্য-সুইফের সাথে কথাবার্ত্তা একরকম বন্ধ করে দিলেন।

কোন নবজাত শিশুর অভিষেক উপলক্ষে হঠাৎ গির্জ্জায় একটা ঘড়ী বেজে উঠল। আমাদের স্থূলকায় স্ত্রীলোকটির একটি ছেলে

"দ'ইভটোৎ" নামে কৃষকের গৃহে লালিত পালিত হচ্ছিল। সে বছরে একবার করেও তাকে দেখত না, কখনো তার কথা ভাবতও না। কিন্তু যে শিশুটির অভিষেক হচ্চে তার কথা ভেবে হঠাৎ তার মনে নিজের শিশুটির উপর প্রবল স্নেহ জেগে উঠল। এই অভিষেক দর্শনের ইচ্ছা চাপতে না পেরে সে বেরিয়ে গেল।

সে বেরিয়ে যাওয়া মাত্র উপস্থিত সকলে পরস্পরের প্রতি চেয়ে চেয়ার টেনে এনে ঘেঁষে বসলেন; কারণ বর্ত্তমান অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে কোন উপায় স্থির করা কর্ত্তব্য। লোয়াসেওর মাথায় এক বুদ্ধি খেল্‌ল। সে বললে যে অফিসারকে গিয়ে বলা যাক যে সে শুধু বুল-দ্য-সুইফকে আটক রেখে বাকী সকলকে ছেড়ে দিক।

ম্যাঁসে কোলেঁভি এই ভার নিয়ে গেলেন। কিন্তু উপরে যাওয়া মাত্রই তাকে নেমে আসতে হল। অফিসার মানুষের স্বভাব জানত, সে বলে দিলে যে তার ইচ্ছা পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সে সকলকেই আটক রাখবে—কাজেই কোলেঁভিকে দরজা থেকেই ফিরতে হল।

ব্যাপার দেখে মাদাম লোয়াসেওর মেজাজ বিগড়ে গেল। সে অতি নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকের স্বভাব সিদ্ধ ইতরতার সহিত বললে—

"এখানে বসে বসে বুড়ো হয়ে মরতে আমরা কেউ রাজি নয়। ও ছুঁড়ীটার পেশাই যখন, সব রকমের মানুষকে ঘরে নেওয়া তখন এমনতর বাছাবাছির দরকার কিরে বাপু? আপনারা জানেন না ও মাগী রোঁয়ায় যাকে তাকে ঘরে ঢুকিয়েছে, এমন কি গাড়ীর কোচওয়ান পর্য্যন্ত! আজ্ঞা হ্যাঁ,—প্রিফেক্টের কোচওয়ানও বাদ যায় নি। সে আমাদের দোকানে থেকেই মদ কেনো, এ কথা বেশ

ভাল করেই আমি জানি। আজ আমরা বিপদে পড়েছি, আর উনি সতীসেজে বসেছেন—লক্ষ্মীছাড়ী কোথাকার! অফিসারের দোষ কোন্ জায়গাটায় দেখিয়ে দেও ত শুনি?: বেটা ছেলে তু সে?"

শ্রোত্রী মহিলা দু'জন একটুখানি কেঁপে উঠলেন। সুন্দরী মাদাম কারে-লামাডোঁর মুখখানি একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেল—যেন অফিসার তখনই তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবে এই ভেবে।

পুরুষেরা একটু দূরে তাঁদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, এখন এগিয়ে এলেন। লোয়াসেও ক্রোধে অধীর হয়ে, হাত পা বেঁধে ঐ সর্ব্বনাশী ছুঁড়িটাকে শত্রুর কাছে ধরিয়ে দেবার প্রস্তাব করলে। কিন্তু কাউণ্ট চালাকি করে কাজ উদ্ধারের পক্ষপাতী—তাঁর তিন পুরুষ "আম-বাসেডর-গিরি" করে গেছেন—ডিপ্লোমাটের চাল চলন তাঁর পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

—তিনি বললেন একটা কিছু স্থির করা প্রয়োজন। সকলে ষড়যন্ত্র করতে বসলেন।

মহিলারা সকলে ঘেঁষে বসলেন, অতি নীচু গলায় আলোচনা চল্‌ল। সে আলোচনায় সকলেই যোগ দিলেন, সকলেই নিজের মতামত ব্যক্ত করতে লাগলেন। এতে আসর জমকালো হয়ে উঠল। বিশেষতঃ মহিলারা সেরা সেরা বদ্ কথা গুলো বলবার সময় যে সুন্দর মুখভঙ্গী করেছিলেন, যে মধুর ও পরিষ্কার ভাবব্যঞ্জক বিশেষ্য বিশেষণ ব্যবহার করছিলেন তাতে আলোচনা অতি চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠছিল। ভাষার উপর এত অত্যাচার করা কেন যে হচ্ছে, সেটা কোন আগন্তুকের বোঝবার সাধ্য ছিল না।

সংসারের তাবৎ স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা ঠিক ঠিক চিকণ

প্রলেপের মত আলগা ভাবে তাদের গায়ে লেগে থাকে—এমন একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপারের রসালোচনায় সেটা আপনা হতে উবে গেল মনে মনে সকলে বেজায় খুসী হয়ে উঠলেন, সকলের মনের নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ল। লোভী পাচক অপরের ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করতে যেমন আহ্লাদ বোধ করে, পরের কেলেঙ্কারী নিয়ে তাঁরাও তেমনি মেতে উঠলেন।

সকলের আহ্লাদ উপচে পড়তে লাগল—সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া এমনি মজার। কাউণ্ট সাহস করে দু'চারটে রসিকতা ছাড়লেন, কিন্তু সেগুলো এমনি চমৎকার করে বলা হল, যে সকলেই হাসলেন। লোয়াসেও তার পছন্দসই দু'চারটে রসিকতা ছুড়ে দিল, কিন্তু কেউ তাতে নাক সিটকালেন না। তার স্ত্রী যে সোজা কথাটা অতি পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করেছিল, সেইটে ঘুরে ফিরে সকলের মাথায় খেলতে লাগল—"এ কাজ যখন তার পেশা, তখন সে এমন অন্যায় আবদার কেন করবে?"

বহুক্ষণ ধরে সকলে উপায় চিন্তা করতে লাগলেন,—অবরুদ্ধ দুর্গ হস্তগত করতে হলে লোকে যেমন করে চিন্তা করে। প্রত্যেকে ঠিক করলেন কে কি ভার নেবেন, কি কি যুক্তি ব্যবহার করবেন, কি রকম ফিকির দেখাবেন। আক্রমণের প্ল্যান, কল কৌশল, হঠাৎ অসতর্ক আক্রমণ ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হতে লাগল, কি করে এই জীবন্ত দুর্গকে বাধ্য করা যায় যাতে সে শত্রুকে তার ভিতরে ঢুকতে দেয়।

করনুদেৎ এতক্ষণ একা একা চুপ করে বসেছিল,—এই সব আলোচনায় সে কিছুমাত্র যোগ দিল না।

কথাবার্ত্তায় সকলে এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে বুল-দ্য-সুইফের

ফেরবার শব্দ কারো কানে গেল না। কাউণ্ট হঠাৎ বললেন—"চুপ", সকলে মাথা তুললেন। বুল-ত্ত-সুইফ কাছে দাঁড়িয়ে। তাঁরা অমনি থেমে গেলেন কিন্তু প্রথমটা থতমত খাওয়াতে কেউ তার সাথে কথা বলতে পারলেন না। কাউণ্টেস সালোনের লুকোচুরি খেলাতে অভ্যস্ত ছিলেন, তিনি ফস্ করে বলে ফেললেন,—"অভিষেক কেমন দেখলেন?"

মোটা মেয়েটা তখন পর্য্যন্ত সেই ভাবে বিভোর। সে আগাগোড়া সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করে বললে, "সময় সময় উপাসনা করা ভারি ভাল লাগে"।

মহিলারা স্থির করলেন যে প্রাতরাশের সময় পর্য্যন্ত তার সাথে সদ্ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত—কারণ তাতে ওর বিশ্বাসটা ঠিক থাকবে এবং যুক্তি পরামর্শ কানে তুলবে।

খাবার টেবিলে বসে তাঁরা আক্রমণের সূচনা করলেন। প্রথমে আরম্ভ হল আত্মহত্যার গৌরব সম্বন্ধে হেঁয়ালিতে কথাবার্ত্তা। প্রাচীন ইতিহাস থেকে উদাহরণ বের হল জুডিথ ও হলোফারনেস। তারপরেই খামকা এল লুক্রিস ও সেকসটাস্, ক্লিওপ্যাট্রা কেমন করে সমস্ত শত্রুপক্ষীয় সেনাপতিদের নিজের বিছানায় জায়গা দিয়ে তাদের চাকরের তুল্য বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল; তারপর ঐ সব মূর্খ লাখপতিদের স্ব স্ব কল্পনায় তৈয়েরী অদ্ভুত এক গল্প বেরল,—কেমন করে রোমের বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলারা ক্যাপুয়ায় হানিবল, তার সেনানী ও তাবৎ সৈন্যদের সাথে রাত্রিবাস করতেন। এর পর সকলে খুঁজে বের করতে লাগলেন পৃথিবীতে কখন কোন রমণী, বিজয়ী সেনাপতিদের গতিরোধ করেছেন, নিজের দেহকে যুদ্ধ

ক্ষেত্র করে, আদর আলিঙ্গনের প্রভাবে দুর্দ্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর ব্যক্তিদের উপর আধিপত্য করতে পেরেছেন, প্রতিহিংসা সাধন ও দেশ-ভক্তির জন্য সতীত্ব বিসর্জ্জন করেছেন।

এইসব ব্যাপার ভারি চমৎকার করে, ধীর ভাবে বর্ণিত হচ্ছিল, যাতে করে ঐ মহৎ দৃষ্টান্তগুলি অনুসরণ করবার ইচ্ছা বুল-ত্ত-সুইফের মনে এক আধটু জেগে ওঠে।

তাঁদের কথাগুলো শুনলে সকলেরি মনে হবে যে পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য হচ্ছে শুধু নিজের দেহকে বিলিয়ে দেওয়া, সৈন্যদের খেয়াল মাফিক আত্মত্যাগ করা।

Nun যুগল গভীর চিন্তায় মগ্ন, এসব কথা তাদের কানে উঠছিল না, এমনি ভাব দেখাচ্ছিলেন।

সমস্ত বিকেলটা সকলে তাকে ভাববার অবসর দিলেন। কিন্তু কথাবার্ত্তার সময়ে পূর্ব্বে যেমন তাঁরা তার নামের আগে "মাদাম" শব্দ ব্যবহার করতেন, এখন তা না করে হঠাৎ "মাদামোয়াজেল" বল্‌তে সুরু করলেন।—সকলের চোখে সে যে সম্মানের পদবীতে উঠেছিল সেখান থেকে তাকে নাবিয়ে তার প্রকৃত অবস্থা কি সেইটে বুঝিয়ে দেওয়াই হয়তঃ এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

টেবিলে সুপ পরিবেশনের সময় ম্যাঁসে কোলেঁভি পুনরায় আবির্ভূত হয়ে তাঁর পুরাণ বুলি আওড়ালেন,

"প্রুসীয় অফিসার মশাই জানতে চাইছেন, যে মাদামোয়াজেল এলিসাবেথ রুসেট, তাঁর মত বদলেছেন কিনা।"

বুল-ত্ত-সুইফ সংক্ষেপে জবাব দিল, "না ম্যাঁসে।"

কিন্তু ডিনারের টেবিলে প্রতিপক্ষের একজোট ভাঙবার উপক্রম হল। লোয়াসেও গোটা তিনেক বেফাঁস কথা বলে ফেললে। সকলেই নূতন নূতন উদাহরণ বের করবার জন্য মাথা খুঁড়তে লাগলেন—কিন্তু একটা কথাও মনে এল না। হঠাৎ কাউণ্টেস, বোধকরি ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বশতঃই, Nun-দ্বয়ের জ্যেষ্ঠাকে অনুরোধ করলেন যে "সেণ্টদের" জীবনী থেকে বড় বড় দু'চারটে বৃত্তান্ত তাঁদের শুনিয়ে দিন। সেণ্টদের অনেকে এমন কাজ করেছিলেন, যা আমাদের চোখে মন্দ বলেই লাগবে। কিন্তু ঐ রকমের কাজগুলো যদি ভগবানের গৌরব ও পরকালের মঙ্গলের জন্য করা হয়, তবে ধর্ম্মযাজকেরা বিনা বিচারে, সেগুলোর সব দোষ অপরাধ স্খালন করে দেন। যুক্তি খুব প্রবল; কাউণ্টেস, এর অবতারণা করে খুব ফল পেলেন। ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থা-বুঝে-ব্যবস্থা করার স্বভাব বশতঃ রীতিমত মতলব করে হোক, কিংবা নিরেট স্থূলবুদ্ধি, যা অনেক সময় আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়, তার ফলেই হোক, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ষড়যন্ত্রে রীতিমত—সাহায্য করলেন। সকলের ধারণা ছিল তিনি খুব ধীর, স্থির—কিন্তু দেখলেন যে তিনি বেশ রোখালো বক্তিতাবাগীশ ও উগ্রপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। তিনি গ্রাহ্যও করলেন না যে, তার যুক্তিতর্ক জেসুইটদের মতের দিকে যাচ্ছে কি না? মত তাঁর, লৌহের মত কঠিন, তাঁর বিশ্বাসে কোন দুর্ব্বলতা নেই, তাঁর বিবেক সব রকম দ্বিধাশূন্য। আব্রাহামের ত্যাগ-স্বীকার তাঁর চোখে সহজ ও স্বাভাবিক,—কারণ, তিনি বললেন, ঈশ্বরের আদেশ পেলে তিনি নিজে নিজের পিতামাতাকে বিনা বিলম্বে হত্যা করতে প্রস্তুত আছেন। উদ্দেশ্য যেখানে ভাল, সেখানে কোন

কাজই ঈশ্বরের অপ্রীতিকর নয়। কাউণ্টেস, স্ব-অনুকূলে Nun-টির "অথরিটি" আরও ভাল করে কাজে লাগাবার জন্য, তাকে জেরা করে, "উদ্দেশ্য দেখে উপায়ের বিচার"—এই নীতি উপদেশ সম্বন্ধে চমৎকার, শিক্ষাপ্রদ এক বক্তৃতা বের করে নিলেন।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে আপনার মতে আমরা হাজার খারাপ কাজই করি, তার উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তবে ভগবান সে কাজের দিকে না তাকিয়ে শুধু উদ্দেশ্য দেখে আমাদের ক্ষমা করবেন?"

—"এ সত্য কে অস্বীকার করতে সাহস করে? আমাদের চোখে যে কাজ অতি জঘন্য, যদি তার মূলে সদুদ্দেশ্য থাকে, তারই জোরে শেষে অতি মহৎ বলে তা গণ্য হতে পারে।"

এমনি ভাবে তাঁদের কথাবার্ত্তা চল্‌ল—ভগবানের অভিপ্রায়, তাঁর আদেশ, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা চল্‌ল—এবং যে সব ব্যাপারে কস্মিনকালে তাঁর মনোযোগ করবার সম্ভাবনা নেই, সেগুলো সুস্থির ভাবে ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হতে থাকল।

এ আলোচনা আগাগোড়া চাপা, চালাকীপূর্ণ ও মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। কিন্তু ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোকটির প্রত্যেকটি কথা, বুল-স্ব-সুইকের বিরুদ্ধ ভাবকে অনুকূল পথে আনতে লাগল। তারপর আলাপ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হল। মালা-গলায় ঐ রমণী আপন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানগুলো, তার সম্প্রদায়ের, তার নিজের কথা, ও তার পরম প্রিয় প্রতিবাসী "সেঁইত-নিসেফোরের" কথা বললে। হাব্‌রে হাসপাতালে বহুশত বসন্ত রোগাক্রান্ত সৈন্যদের শুশ্রূষার জন্য তাদের আহ্বান করা হয়েছে। ঐ সব হতভাগাদের

চিত্র সকলের সুমুখে সে এঁকে ধরলে, তাদের ব্যারামের খুঁটিয়ে বর্ণনা করলে। পথের মাঝে প্রুসীয়ানটার খামখেয়ালীতে তারা আটকা পড়েছে, এদিকে হয়ত কত ফরাসী দুর্ভাগা মারা যাবে, যাদের খুব সম্ভব শুশ্রূষায় বাঁচিয়ে তুলতে পারা যেত। তিনি বললেন সৈন্যদের শুশ্রূষা করা তাঁর বিশেষ কাজ,—স্পেশিয়ালটি। তিনি ক্রিমীয়াতে, ইটালীতে, অষ্ট্রিয়ায় গিয়েছিলেন, ঐ সব স্থানের অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা এমন চমৎকার করে বলতে লাগলেন যে, হঠাৎ সকলের চোখের সুমুখে ফুটে উঠল তার স্বরূপ-চিত্র,—সাবেক কালের ধর্ম্মোন্মত্তা সন্ন্যাসিনীদের মত, যারা রণ-বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে, সৈন্য-বাহিনীদের পিছু পিছু চলত, যুদ্ধক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আহত যোদ্ধাদের কুড়িয়ে নিয়ে সেবা করত, সামান্য দুই একটা উত্তেজনা বাক্যে, সেনাপতিদের চাইতে বেশী কৃতকার্য্যতার সাথে নিরুৎসাহ সৈন্যবাহিনীদের মধ্যে জীবন সঞ্চার করত; তাঁর রুক্ষ চেহারা ও অসংখ্য বসন্ত চিহ্ন লাঞ্ছিত মুখ দেখে মনে হল, বাস্তবিক তিনি লড়াইয়ের ধ্বংস-লীলার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি!

তার পরে আর কেউ কোন কথা বললে না, তাঁর বর্ণনা এমনি হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

নৈশ ভোজন শেষ হতেই সকলে চট্‌পট্‌ উপরে গিয়ে শয্যার আশ্রয় নিলেন। পরদিন বেশী সকালে উঠতে কারও আগ্রহ দেখা গেল না।

প্রাতরাশ নীরবে শেষ হল। বৃদ্ধা যে বীজ বুনেছিল, সেটা অঙ্কুরিত ও পুষ্পে ফলে পরিণত হয়ে উঠতে সময়ের আবশ্যক বিবেচনা করে, সকলে চুপ করে রইলেন।

বিকেল বেলা কাউণ্ট একটু বেড়িয়ে আসবার প্রস্তাব করলেন। ব্যবস্থামত কাউণ্ট বুল-দ্য-সুইফের হাত ধরে সকলের পিছনে চললেন।

সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা পথের মেয়েদের সাথে কথা বলতে,—"শুনছ বাছা," ইত্যাদি বলে, খানিকটে তাচ্ছিল্য ও খানিকটে মুরুব্বীয়ানা করে আলাপ করেন,—কাউণ্ট ও তেমনি করে অন্তরঙ্গতার ভাব দেখিয়ে বুল-দ্য-সুইফের সাথে আলাপ আরম্ভ করলেন। তিনি প্রথমেই—আসল কাজের কথা পাড়লেন,—"সামান্য একটু উদারতা যা জীবনে আপনি কতবারই ত দেখিয়েছেন, তার বদলে এই অবাধ্যতার দরুণ প্রুসীয়ানরা যে অত্যাচার করবে, তার মুখে সবাইকে ফেলে রাখাই আপনি ভাল মনে করলেন?"

বুল-দ্য-সুইফ কোন উত্তর করলে না।

কাউণ্ট মিষ্টি কথা দিয়ে, যুক্তি তর্ক দিয়ে, প্রাণের কথা বলে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। দরকার হলে তিনি নিজের উচ্চ পদের উপযোগী রসিকতা করতে পারতেন—খোসামুদি ও কোমল ব্যবহারের চূড়ান্ত করতে পারতেন। তাঁদের যে উপকারটা সে ইচ্ছা করলেই করতে পারে, সেটাকে তিনি আকাশে তুলে দিলেন, তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তারপর একদম ঘনিষ্টতার চরমে, "তুমি আমিতে" এসে বললেন,—"আর দেখ, এতে লোকটা বড়াই করতে পারবে বটে, যে সে এমন সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখেছে, যা তার নিজের দেশে একরকম নেই বললেই হয়।"

বুল-দ্য-সুইফ কোন উত্তর না করে, অগ্রগামী দলের সঙ্গে গিয়ে মিললে।

হোটেলে ফিরেই সে সোজা নিজের ঘরে চলে গেল—তাকে আর ফিরতে দেখা গেল না। সকলে ভয়ানক চিন্তাকুল হয়ে উঠলেন,—সে কি স্থির করেছে? এখনও যদি সে রাজি না হয়, তবে কি করতে হবে।

ডিনারের ঘণ্টা বেজে গেল,—সকলে তার জন্য বৃথা দেরী করলেন। তখন ম্যাঁসে কোলেঁভি ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, যে মাদা-মোয়াজেল রুসেট অসুস্থ হয়েছেন, সকলে টেবিলে বসতে পারেন। সকলের কান খাড়া হয়ে উঠল। কাউণ্ট হোটেলওয়ালার কাছে এগিয়ে গিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—

—"কাজ হাঁসিল?"

—"হাঁ।"

তার সঙ্গীদের কাছে কিছু খুলে না বলে তিনি শুধু মাথা নেড়ে ইসারা করলেন। অমনি সকলে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন, সকলের মুখই প্রফুল্ল হয়ে উঠল; "বাঁচা গেল বাপ! হোটেলে শ্যাম্পেন থাকে তবে আনা হোক আমি দাম দেব।"—হোটেলওয়ালা যখন চারটে বোতল হাতে করে ঘরে ফিরে এল, তখন মাদাম লোয়াসেও সেগুলোর দিকে চেয়ে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করলেন। দেখতে দেখতে সকলের মুখ খুলে গেল, কথাবার্ত্তায় আসর জাঁকিয়ে উঠল। খুসীতে সকলের দিল মসগুল হয়ে উঠল। কাউণ্ট হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে মাদাম কারে-লামাডোঁ প্রকৃতই সুন্দরী। তুলার ব্যবসায়ী ম্যাঁসে কারে-লামাডোঁ কাউণ্টেসকে খুসী করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ঠাট্টা মসকরা ও ফূর্ত্তিতে সকলে প্রাণ খুলে কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন।

হঠাৎ লোয়াসেও মুখ গম্ভীর করে, হাত তুলে বলে উঠলে, "আস্তে"! সকলে আশ্চর্য্য হয়ে ও ভয় পাবার মত চেহারা করে' চুপ করে গেলেন। সে কাণ খাড়া করে, গোল থামাবার জন্য দু'হাত উঠিয়ে, ঘরের ছাদের দিকে দুই চোখ তুলে খানিকক্ষণ কি যেন শুনলে,—তারপর তার সাধারণ গলায় বললে, "কোন ভয় নেই, ঠিক চলছে।"

প্রথমটা কেউ যেন বোঝেন নি এই ভান করলেন, তারপর সকলের মুখেই মৃদুহাসির উদয় হল।

মিনিট পনের পরে ফের সে ঐ অভিনয় করলে;—সমস্ত সন্ধ্যা ধরে বার বার এই কারবার চল্‌ল। সে যেন উপর তলার কোন ব্যক্তি বিশেষের সাথে কথা বলছে, ও তাকে দ্ব্যর্থবোধক দু'চারটে পরামর্শ দিচ্ছে, সেগুলো তার ব্যবসা ও চরিত্রের উপযুক্ত বটে। কখনো দুঃখার্ত্ত মুখ করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলছে, "বেচারা মেয়েটা!" আবার হয়তঃ রাগের ভাণ করে, দাঁতে দাঁত ঘষে বলছে, "হতভাগা, পাজি প্রুসীয়ান!"—থেকে থেকে সকলে যখন হয়তঃ অন্য কথা বলছে, মাথা নেড়ে জোরগলায় বলে উঠছে, "বেশ, বেশ," এবং যেন নিজের মনেই বলছে,—"মেয়েটাকে আর দেখতে পাই কিনা,—বজ্জাত লোকটা তাকে না মেরে ফেললে হয়।"

এইসব রসিকতা নিতান্ত বদরুচির পরিচায়ক হলেও, সকলেই এতে আমোদ বোধ করছিলেন, কেউ আপত্তি প্রকাশ করলেন না। কারণ, অপর সব মনোভাবের মত ক্রোধের প্রকাশও নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করে,—কিন্তু যে ভাব তখন

সকলের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেটার মূলে ছিল যত অশ্লীল ও বদচিন্তা।

ডিনারের শেষের দিকে মহিলারা পর্য্যন্ত দু' চারটে মার্জ্জিত ও মনোজ্ঞ রসিকতা করলেন। সকলের চোখ চক্‌চকে হয়ে উঠল,—পান কার্য্যটি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় হয়েছিল। কাউণ্ট সবরকম অবস্থাতেই নিজের পদোপযোগী গাম্ভীর্য্য ঠিক রাখতে পারতেন—তিনি একটা উপমা না দিয়ে থাকতে পারলেন না,—সে উপমাটা হচ্ছে এই যে মেরু প্রদেশে শীতের শেষ হলে, যারা জাহাজ আটকে বন্দি অবস্থায় ছিল, তাদের কি আহ্লাদ হয় যখন তারা দেখে যে দক্ষিণের পথ খোলসা হয়ে গেছে।

লোয়াসেও টক করে উঠে দাঁড়িয়ে—হাতে এক গেলাস শ্যাম্পেন নিয়ে বললে, "আমাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে।" সকলে দাঁড়িয়ে গেলেন—তার প্রশংসা করলেন Nun-দুটি পর্য্যন্ত, মহিলাদের অনুরোধে, গেলাসের ঐ সফেন মদে চুমুক দিতে রাজি হলেন,—যদিও শ্যাম্পেন তাঁরা জীবনে কখন স্পর্শ করেন নি। তাঁরা বলেন যে ওর স্বাদ লেমনেডের মত কতকটা, কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভাল।

লোয়াসেও সকলের মনের কথা একাই প্রকাশ করে, বললে,—"দুঃখের বিষয় হাতের কাছে একটা পিয়ানো নেই, থাকলে একপাক নাচলে মন্দ হত না এ সময়ে।

করনুদেৎ এ পর্য্যন্ত একবারটিও মুখখোলেনি, খোলবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করে নি। তাকে দেখলে মনে হয় সে অত্যন্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন। থেকে থেকে সে শুধু তার লম্বা দাড়ি সজোরে টানছিল,

যেন তার ইচ্ছা ওটা টেনে সে আরও লম্বা করে। দুপুর রাত্রে সকাল যখন নিজ নিজ ঘরে যাবে, তখন নেশায় টলটলায়মান লোয়াসেও তার পেটের উপর এক থাবড়া মেরে মাতালের অস্পষ্ট উচ্চারণে বললে, "আপনাকে কিছু খুশী বলে মনে হচ্ছে না ত এখন, কোন কথা বললেন না।" করনুদেৎ চট্‌করে মাথা উঠিয়ে, তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে সকলের দিকে চেয়ে, বললে, "আপনারা সকলে কেলেঙ্কারী করলেন,—আমি বলছি কেলেঙ্কারী—করলেন।" সে উঠে দোরের কাছে গিয়ে আবার বললে "কেলেঙ্কারী" তারপর বেরিয়ে চলে গেল।

প্রথমটা এই ব্যাপারে সকলে ভেবড়ে গেলেন। লোয়াসেও বেকুব হয়ে হাঁ করে রইল। একটু পরেই তার মাথায় বুদ্ধি এল, সে চট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে ভঙ্গী করে বললে, "ও দুটোই একেবারে কাঁচা, বুঝলে বন্ধু, একেবারে কাঁচা"। সকলে কিছুই বুঝতে পারলেন না দেখে সে সেই "করিডোর রহস্য" বিবৃত করলে। ব্যাপার শুনে সকলের আমোদে জোয়ার লেগে গেল। মহিলারা স্ফূর্ত্তির আধিক্যে পাগলের মত হয়ে গেলেন। হাসতে হাসতে কাউণ্ট ও ম্যাসে কারে-লামাতোঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

—তাই কি? আপনি ঠিক বলেছেন? সে গিয়েছিল—

—আরে আমি চোখে দেখেছি।

—ও বেটি রাজি হল না—

—কারণ, প্রুসীয়ানটা পাশের কামরায় ছিল।

—এও কি সম্ভব?

—আমি হলফ করে বলতে পারি।

কাউণ্টের দম বন্ধ হবার যোগাড় হল। তুলার ব্যবসায়ী দু'হাতে পেট চেপে ধরলেন। লোয়াসেও বললে, "কাজেই বুঝতে পারছেন, যে আজকের—ব্যাপারটায় ও লোকটা কিছু মজা পাচ্ছে না—একেবারেই কিছু না"।

তারপর তিনজনে হাঁস ফাঁস করতে করতে, টলতে টলতে, কোন মতে নিজ নিজ ঘরের দিকে চললেন।

উপরতলায় গিয়ে সকলের ছাড়াছাড়ি হল। মাদাম লোয়াসেও বিছানায় শুয়ে তাঁর স্বামীকে বললেন যে কারে লামাডোঁর ঐ ঠ্যাকারী কচকে বৌটা সারা সন্ধ্যা হাসতে হাসতে পাঁশুটে মেরে গেছে।—"আর জানইত স্ত্রীলোকগুলো যখন সৈনিকের য়ুনিফরমের গোঁ ধরে তখন সে সৈনিক ফরাসী হোক বা প্রুসীয়ান হোক তাদের কাছে একই কথা—একি কম ঘেন্নার কথা মাগো!"

সমস্ত রাত্রি ধরে করিডোরের অন্ধকারে নানারকম ঘুস্‌ঘাস্‌, খস্‌খস্‌, মানুষের নিশ্বাসের ও খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করবার মত অস্পষ্ট শব্দ ইত্যাদি কানে আসতে লাগল। সকলে অনেক রাত্রি অবধি জেগে ছিলেন, কারণ, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দোরের ফাঁক দিয়ে আলো জ্বলছে দেখা গেল। শ্যাম্পেন ষোল আনা সুদ আদায় করে নেয়, ঘুমের উপর, তার নাকি বড় রাগ।

পরদিন সকাল বেলায় শীতের সুন্দর ঝরঝরে সূর্য্যের আলো চারদিকের বরফ-ঢাকা ক্ষেত মাঠ সব জ্বলজ্বলে করে তুলেছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের গাড়ী, এত গোলমালের পর তবে তাতে ঘোড়া যোতা হয়েছে। একপাল সাদা রংয়ের পায়রা, ক্ষ্যাকম

ধরে, মাঝে কাল-তারা-চিহ্নিত লালচে চোখ মেলে, অত্যন্ত বিজ্ঞভাবে ছটা ঘোড়ার পেটের নীচে, পায়ের পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কোচওয়ান তার ভেড়ার লোমের পোষাক গায়ে দিয়ে, কোচবাক্সে বসে পাইপ টানছিল,—যাত্রীরা খুসীমনে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে, পথের জন্য কিছু খাবার বেঁধে নিচ্ছিলেন।

কেবল বুল-দ্য-সুইফের জন্য গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। একটু পরেই সে এল।

তাকে দেখে দুঃখিত ও লজ্জিত বলে মনে হল। অতি ধীরভাবে সে সঙ্গীদের দিকে অগ্রসর হল। তাঁরা তাকে যেন দেখেন নি, এই ভাবে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কাউণ্ট গম্ভীর ভাবে তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে, তার অশুচি স্পর্শ থেকে দূরে সরে গেলেন।

মোটা মেয়েটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর সমস্ত সাহস সংগ্রহ করে, অতি বিনীত ভাবে "প্রাতঃ-নমস্কার" বলে তুলার ব্যবসায়ীর স্ত্রীকে সম্বোধন করলে। তিনি অতি উদ্ধত ভাবে কট্‌মট্‌ করে তার দিকে চাইলেন। সকলেই অতিমাত্র ব্যস্তসমস্ত ভাব দেখাতে লাগলেন—ও তার কাছ থেকে দূরে সরে সরে থাকলেন, যেন তার পোষাকের মধ্যে সে কোন ছোঁয়াচে রোগের বীজ পুরে রেখেছে। তারপর সকলে হুড়মুড় করে গাড়ীতে উঠে পড়লেন, সে একা শেষে পড়ে রইল। সকলের বসা হলে ধীরে, নির্ব্বাক ভাবে গিয়ে প্রথমে আসবার সময় যেখানে বসেছিল, সেই জায়গায় চুপ করে বসলে।

কেউ তার দিকে ফিরে চাইলে না, তাকে যেন কেউ মোটে চেনেনই না। কেবল মাদাম লোয়াসেও তার ও আপনার মধ্যে

দূরত্ব বিবেচনা করে তার স্বামীকে নিম্নস্বরে বললে,—কি সৌভাগ্য যে ওটার কাছ থেকে আমি দূরেই বসেছি।

গাড়ী ঝাঁকুনি দিয়ে নড়ে উঠে, আবার যাত্রা সুরু করল।

প্রথমে কেউ কোন কথা বললে না। বুল-স্ত-সুইফ সাহস করে চোখ দু'টো তুলতে পারলে না। তার মনে তখন সঙ্গীদের বিরুদ্ধে রাগ জমে উঠেছে—তারাই ত তাকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত করে তুলেছে—ভণ্ডামি করে প্রুসীয়ানটার কোলের উপর তাকে দু'হাতে ঠেলে দিয়েছে।

এতক্ষণের এই অসহ্য নিস্তব্ধতা ভাঙ্গবার জন্য কাউণ্টেস মাদাম কারে-লামার্ডোকে সম্বোধন করে বললেন,—

—আপনি বোধ হয় মাদমোয়াজেল দ' এট্রেলেশ-কে জানেন?

—হ্যাঁ, তিনি ত আমার একজন বন্ধু।

—ভারি বিদুষী মহিলা?

—তা আর বলতে? তিনি বিদুষীদের মধ্যেও একজন রীতিমত শিক্ষিত, পাকা আর্টিষ্ট। তার গানে মোহিত না হয় এমন লোক নেই, আর ছবি যা আঁকেন তা একেবারে নিখুঁত করে।

তুলার ব্যবসায়ী ও কাউণ্ট আলাপ করতে লাগলেন—কাঁচের শার্শি দেওয়া জানলার ঝকর ঝকর শব্দ ছাপিয়ে তাঁদের দু'একটা কথা মাঝে মাঝে কানে আসছিল—"মেয়াদ," "প্রিমিয়াম"—ইত্যাদি।

লোয়াসেও তাঁর স্ত্রীর সাথে তাস খেলতে সুরু করলে।

Nnn-দ্বয় হাতে জপের মালা নিয়ে, একসঙ্গে ক্রসের প্রতিরূপ বাতাসে এঁকে, অতিদ্রুত গতিকে অস্পষ্ট শব্দ করে ঠোঁট নাড়তে সুরু করলেন। মাঝে মাঝে একটা মেডেল চুম্বন করে, আবার

বাতাসে ক্রস চিহ্ন এঁকে, গুণ্ গুণ্ শব্দ করে, জপ করতে লাগলেন।

করসুজেৎ ঠায় বসে চিন্তা করতে লাগল। তিনঘণ্টা পরে লোয়াসেও তাস কুড়িয়ে নিয়ে বলে উঠলে,—"ক্ষিদে পেয়েছে"।

লোয়াসেও-পত্নী একটা প্যাকেট থেকে একখণ্ড বীফ বের করে সেটাকে টুকরো টুকরো করে কাটলেন। তারপর দু'জনে খেতে সুরু করলেন।

"আমরাই বা বাদ যাই কেন"?—কাউণ্টেস বললেন। তিনি একটা খাবারের বাকস থেকে নানারকম সুখাদ্য বের করলেন। তাঁর বাক্সে দু'বারের খাবার মত জিনিস জমানো ছিল।

Nnn-দ্বয় পিঁয়াজের গন্ধওয়ালা খানিকটে মাংসের কাবাব কাগজের মোড়ক খুলে বের করলেন। করসুজেৎ তার কোটের বিশাল দু'পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটার মধ্যে থেকে বের করলে সিদ্ধকরা খোসা সমেত গোটাকয়েক ডিম, আর একটা থেকে একখানা রুটি। ডিমের খোসা ছাড়িয়ে, খোসাগুলো পায়ের নীচে খড়ের উপর ফেলে দিয়ে ডিম কামড়ে খেতে লাগল—ডিমের মধ্যের হল্‌দে রঙের বস্তুর দু'চারটে কণা তার বিশাল দাড়ির মধ্যে ঢুকে, সন্ধ্যাবেলার নক্ষত্রের মত চিক্‌চিক্ করতে লাগল।

ভোরবেলার তাড়াতাড়ি ও মাথার গোলমেলে অবস্থায় বুল-স্ত-সুইফ খাবারের কথা ভাবতেই সময় পায়নি। তাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত না করে সকলে নিশ্চিন্ত মনে যার যার মত খাচ্ছিল—এই দেখে তার মন কেবল অভিমানে ভরে উঠছিল। ক্রোধের উত্তেজনায় যত

রকমের গালিগালাজ বুকের ভিতর থেকে ঠেলে তার জিবের আগায় এসে জমা হচ্ছিল, তাদের অন্যায় ব্যবহারের জন্য সবাইকে একেবারে লজ্জিত, অভিভূত করে দেবার জন্য—কিন্তু রাগের চোটে তার গলা আটকে গিয়েছিল, গালগুলো বেরোবার পথ পাচ্ছিল না।

একটি লোকও তার দিকে দৃষ্টিপাত করছিল না, তার কথা ভাবছিল না।

তার মনে হচ্ছিল, সে যেন ঐ সব সাধু ও সাধ্বী কপটাচারীদের দারুণ ঘৃণার অতল সমুদ্রে তলিয়ে গিয়েছে—ওরাই না প্রয়োজন কালে তাকে আকাশে তুলে দিয়ে বলি দিয়েছিল, আর এখন প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাই অনাবশ্যক ও অকেজো বলে তাচ্ছিল্যভরে তার দিক থেকে মুখ ফেরাচ্ছে? তারপর তার খাবার প্রকাণ্ড ঝুড়িটার কথা তার মনে হল,—তখন ত রাক্ষসের মত ওরাই তার ফাউল রোষ্ট, প্যাষ্ট্রি, ফল, চার বোতল বরদ্যো, সব খুঁটিয়ে গিলেছিল? এই সব ভাবতে ভাবতে, বেশী টানাটানিতে শক্ত রশি যেমন পট্ করে ছিঁড়ে যায়, তেমনি তার রাগ পড়ে গিয়ে কান্নার বেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কান্না চাপবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল,—ছোট ছেলে মেয়েরা যেমন করে ঢোক গিলে উচ্ছ্বসিত কান্না চাপতে চায়, তেমনি করে ফুঁপিয়ে উঠতে লাগল,—কিন্তু দেখতে দেখতে চোখের পাতা জলে ভিজে ভারী হয়ে এল,—তারই দুইটা বড় বড় ফোঁটা টসটস করে গাল বয়ে ঝরে পড়ল।

পাথর কেটে ঝরণার জল যেমন ঝরঝরিয়ে নেমে যায়, বাধাহীন তার চোখের জল, তেমনি নিজের বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে গাল ছাপিয়ে বুকের উপর পড়তে থাকল। কেউ সে জল লক্ষ্য না করে, এই মনে

করে সে স্থির দৃষ্টিতে চুপ করে বসে রইল,—তার মুখের চেহারা তখন কঠিন ও রক্তলেশশূন্য।

কিন্তু সে জল কাউণ্টেসের চোখে পড়ল, তিনি ইসারায় তাঁর স্বামীকে দেখালেন। তিনি শুধু দুই কাঁধ একবার নাড়লেন—অর্থাৎ, "সবাই জানে এতে আমার কোন দায় দোষ নেই।" মাদাম লোয়াসেও নিঃশব্দে খানিক বিজয়ের হাসি হেসে নিলেন ও নিম্নস্বরে বললেন,—"ছুঁড়িটা লজ্জায় কাঁদছে।"

Nun-দ্বয় আহারশেষে বাকী কাবাবখানি কাগজে জড়িয়ে রেখে, আবার জপ তপ আরম্ভ করলেন।

করনুদেৎ তার ডিমগুলো ধীরে সুস্থে হজম করছিল। এখন লম্বা সরু দুই ঠ্যাং সামনের বেঞ্চির নীচে টান করে মেলে, পিঠ হেলিয়ে, দুই হাত আড়াআড়ি করে কোলের উপর রেখে,—কোন রং-তামাসা দেখে উৎফুল্ল সমজদার দর্শকের মত একটুখানি মৃদু হাসি হেসে—শিষ দিয়ে "লা মার্সেলেজ" নামক পেট্রিয়টিক গানটি গাইতে সুরু করলেন।

গাড়ীর ভিতরকার চেহারাগুলো অস্পষ্ট হয়ে এল। সেই বিখ্যাত গীতটি কাউকে খুসী করতে পারছিল না। ভাব দেখে মনে হচ্ছিল তাঁরা বিরক্তি ও অসোয়াস্তি বোধ করছিলেন, এবং পর মুহূর্ত্তেই যেন খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে চীৎকার করে উঠবেন, রাস্তার ব্যারেল-অরগানের আওয়াজ শুনলে কুকুরগুলো যেমন করে ওঠে, করনুদেৎ এই ভাব লক্ষ্য করলে, কিন্তু তার সঙ্গীতের বিরাম হল না। নীচের পদ ক'টি সে ফিরে ফিরে গাইতে থাকল,

Amour acré de la Patrie,
Conduis, soutiens, nos bras Vengeurs,
Liberté, liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs !

(পবিত্র স্বদেশ-প্রেম প্রতিশোধ নিতে উদ্যত আমাদের বাহুতে বল দেউক, হে প্রিয় স্বাধীনতা, তোমার রক্ষার জন্য যারা লড়ছে, তাদের সহায় হও)।

রাস্তার বরফ জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গিয়েছিল, গাড়ী দ্রুত ছুটে চলল তার উপর দিয়ে। দীয়েপ অবধি সমস্ত রাস্তাটা গাড়ীর বিষম ঝাঁকুনি, সন্ধ্যার ম্লান আলো, রাত্রে গাড়ীর ভিতরের ঘন অন্ধকার—সব অগ্রাহ্য করে, একরোখা হয়ে, তার একঘেয়ে নিষ্ঠুর শিষ দেওয়া চলতেই থাকল। গাড়ীর ক্লান্ত, রুষ্ট আরোহীদলকে নিরুপায় হয়ে তার গীতের প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত অনুসরণ করতে হচ্ছিল—তার শিষ অনুযায়ী প্রত্যেকটি কথা তাঁদের মনে ফুটে উঠছিল।

বাধাহীন, বিরামহীন হয়ে বুল-দ্য-সুইফের চোখের জল ঝরে পড়ছিল,—মাঝে মাঝে একটা অবাধ্য দীর্ঘশ্বাস সেই গীতের দুই পদের ফাঁকে বাইরের ঘনান্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

শ্রীননীমাধব চৌধুরী।

১৩ই মে, ১৯২২।